দেবজ্যোতি
ধুলোখেলা
অতীতের সাগর সেঁচে মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বরুন রেজ
স্ক্যান করেছেন - বরুন রেজ
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

বাংলা ১৩২৯ সাল
প্রতিষ্ঠাতা
স্বর্গত
আশুতোষ ধর

সচিত্র মাসিক

শিশুসাথী

ইং ১৯২২ সন
৪৮শ বর্ষ
বৈশাখ সংখ্যা
১৩৭৬

বার্ষিক মূল্য ৬.০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ·৬০ পয়সা

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	শিশুসাথীর নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১
২।	নতুন দিনে (কবিতা)	শ্রীশান্তশীল দাস	২
৩।	পুরানো সেই দিনের কথা	শ্রীসুনন্দা দাশগুপ্ত	৩
৪।	ডানপিটে (কবিতা)	শ্রীবেলা দেবী	৮
৫।	নববর্ষের উৎসব	স্বপনবুড়ো	৯

শিশুদিগের যকৃৎ রোগে উপকারী

সুস্থ শিশুকেও মধ্যে মধ্যে কালমেঘ সেবন করাইলে লিভারের দোষ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

বেঙ্গল কেমিক্যালের

কালমেঘ

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে কালমেঘ
তিক্ত, অগ্নিদীপক, বলকারক
ও পিত্তনিঃসারক
ইহা আবালবৃদ্ধ সকলের পক্ষেই হিতকর

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

সূচী

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৬। কবিপুত্র শমীন্দ্রনাথ, কন্যা-মাধুরীলতা, রেণুকা ও মীরা	শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত	১৫
৭। ইয়াসিন	শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত	২৫
৮। এক রোগী আর তিন হাতুড়ে	শ্রীসুবীর চট্টোপাধ্যায়	৩০
৯। ছড়াচ্ছড়া ঃ		
(১) গ্রীষ্মের ছড়া	শ্রীমনীষ বসু	৩৫
(২) ঢোল বলে	শ্রীপ্রীতিভূষণ চাকী	৩৫
১০। মজার ম্যাজিক ঃ		
বিলেত যাবার পথে এডেন বন্দরে	যাদুকর এ. সি. সরকার	৩৬

Lord's
লর্ডের
লজেন্স ও টফি
জেম্‌স্ লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ
কলিকাতা-১

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১১।	তোমাদের পাতা ঃ		
	(১) বোশেখ এলো (কবিতা)	শ্রীগৌরকিশোর দাস	৩৯
	(২) ইতিহাসের পাতা থেকে	শ্রীরণজিৎ বসু	৪০
	(৩) ঘুমপাড়ানি গান (কবিতা)	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়	৪১
১২।	মৈত্রেয় (কবিতা)	শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র ভৌমিক	৪২
১৩।	যখন ভাবি তোমাকে (কবিতা)	শ্রীতমাল চট্টোপাধ্যায়	৪২
১৪।	বিজ্ঞান-বিচিত্রা ঃ		
	চাঁদে নামার মহড়ায় (১)	শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৩
১৫।	বেনগাজীর আখড়া	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৪৫

ছোটদের উপহার দেবার মতো কয়েকটি বই

হাসির বই			**ক্লাসিক**	
শিবরাম চক্রবর্তীর	হাসির গল্প	১·৫০	কথা সরিৎসাগরের গল্প	৩·০০
নারায়ণ গাঙ্গুলীর	হাসির গল্প	২·৫০	বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান	৩·৫০
স্বপনবুড়োর আরো	হাসির গল্প	২·৫০	ছোটদের আরব্য উপন্যাস	২·৫০
বিভূতি মুখোঃর	হাসির গল্প	২·৫০	দশকুমার চরিতের গল্প	১·৫০
আশাপূর্ণা দেবীর	হাসির গল্প	২·৫০	উদয়ন ও বাসবদত্তার গল্প	·৫০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের	হাসির গল্প	২·৫০	পুরাণের সেরা গল্প	২·০০
কুমারেশ ঘোষের	হাসির গল্প	২·০০	মহাভারতের গল্প	১·৫০

নানা দেশের রূপকথা ॥ মনোরম গুহ-ঠাকুরতা ২·০০ **নীল সাগরের নীচে** ২·০০

ওয়ার অ্যাণ্ড্ পীস ॥ অশোক গুহ ২·০০ **পিকউইক পেপারস্** ॥ অশোক গুহ ২·০০

গল্পের রাজা ক্রীলভের গল্প ॥ অনিলেন্দু চক্রবর্তী ২·০০ **গল্পে কাদম্বরী** ১·৫০

রবিনসন ক্রুসো ॥ অশোক গুহ ২·০০ **রবীন হুড** ॥ দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ২·০০

গালিভার্স ট্র্যাভেলস্ ॥ দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ২·০০ **শিব্রাম THE ভূপর্যটক** ২·৫০

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং ॥ ৬।১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২। ফোঃ ৩৪-৪৩১০

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১৬।	শেষ দিন	শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ	৫৩
১৭।	ভণ্ডুলের স্বপ্নভঙ্গ	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	৫৬
১৮।	উপেন্দ্রকিশোর	শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ	৬০
১৯।	ছোটদের ভাল ভাল বই		৬২
২০।	শঙ্খচূড় ও লৌহচূড়	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৬৩
২১।	শরীরচর্চার বৈঠক	বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়	৬৭
২২।	খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	৬৯
২৩।	নতুন ধাঁধা	শ্রীপিনাকীনাথ ব্যানার্জি	৭০
২৪।	চৈত্র মাসের ধাঁধার উত্তর		৭০
২৫।	সম্পাদিকার চিঠি		৭১

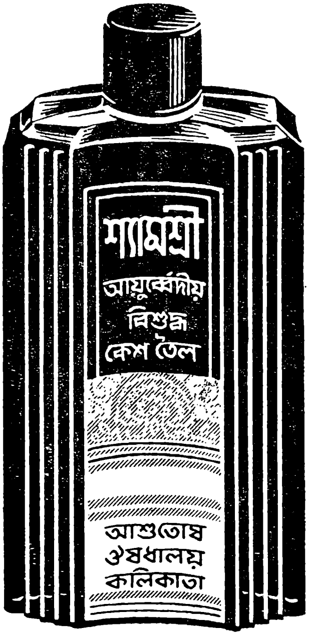

শ্যামশ্রী কেশ তৈল

✻ আয়ুর্বেদীয় কেশবর্ধক উপাদানে প্রস্তুত ✻

(সুগন্ধিযুক্ত)

মাথা ঠাণ্ডা রাখে—চুলের শ্রীবৃদ্ধি করে, কেশ পতন নিবারণ করে ও কেশের অকাল-পক্কতা বন্ধ করে। কেশগুচ্ছের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়।

প্রতিশিশি—১.৮৮ তিন শিশি—৫.২৫

ছয় শিশি—১০.০০

আশুতোষ ঔষধালয়—ঢাকা

৫-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

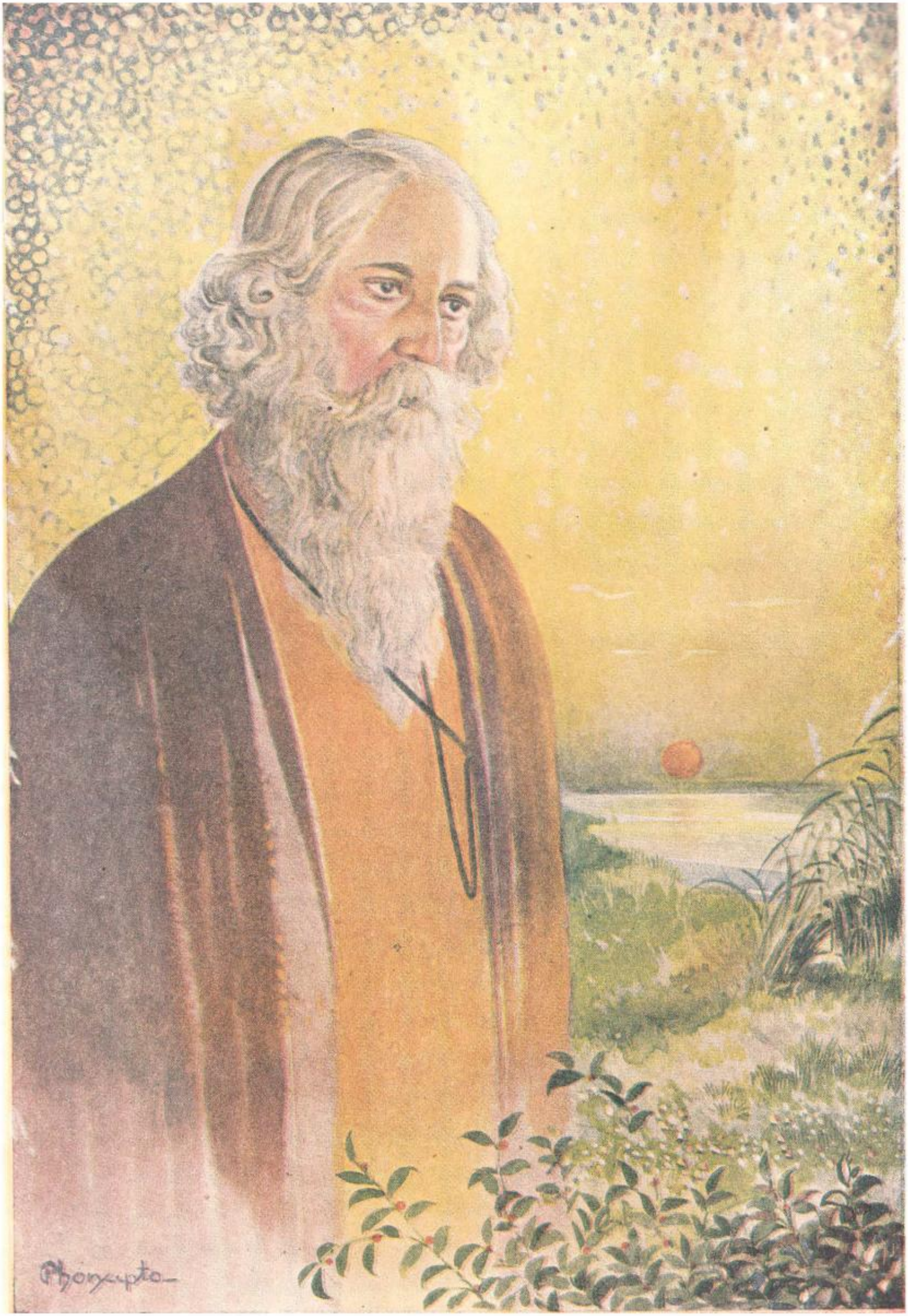

প্রথম প্রকাশ ১৩২৯
শিশুসাথী
CK

৪৮শ বর্ষ বৈশাখ, ১৩৭৬ ১ম সংখ্যা

শিশুসাথীর নব বর্ষ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমাদের এই বর্ষ নব, বর্ষ শুভ হোক,
আনুক নূতন ভরসা আশা আনন্দ আলোক।
জানিয়ে দেন চন্দ্র তাঁহার গোপন সুধার কথা
চন্দ্রলোকের সব পরিচয় পাই যেন সর্বদা।
গ্রহে গ্রহে যে মিতালি পাতাতে উৎসুক,
ঘটুক তাহাই, সুদূর যাহা নিকটে আসুক।
ভগবানের নূতন খবর আমরা পেতে চাই,
ইহার চেয়ে বড় জিনিস জানার কিছু নাই।
সর্বাপেক্ষা বড় মোদের হচ্ছে যে এই সাধ,
আনুক বরষ ডালা ভরে তাঁহার আশীর্বাদ !
কমে আসুক তাঁহার সাথে মোদের ব্যবধান,
মোদের ব্যাকুল ডাকটি তিনি শুনতে যেন পান।

নতুন দিনে

শ্রীশান্তশীল দাশ

নতুন দিনে আলোয় রাঙা আজকে চারিধার,
নেইকো কোথাও একটু কালো একটু অন্ধকার।
আকাশে আজ আলোর খেলা,
মাটিতে আজ আলোর মেলা ;
সেই খেলাতে মাতবো সবাই খুলবো মনের দ্বার।

আজকে শুধুই হাসির মেলা, আজকে শুধুই গান,
হাসি গানে ভরিয়ে দেব আজকে সবার প্রাণ।
যে আছে আজ আঁধার ঘরে,
দু'চোখে যার কান্না ঝরে,
আনবো টেনে আলোয়, ব্যথা মুছিয়ে দেব তার।

নতুন দিনে আলোর রঙে রাঙিয়ে নিয়ে মন,
চলবো সবাই সমুখ পানে—আজকে নিলাম পণ।
পেছিয়ে যারা রইবে প'ড়ে,
আনবো তুলে দু'হাত ধরে,
একটি সুরে বাজবে বাঁশি আনন্দে সবার।

'পুরানো সেই দিনের কথা'

সুনন্দা দাশগুপ্ত

—এক—

অনেক, অনেকদিন আগেকার কথা। বাংলাদেশে তখন বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতিষ্ঠা। বৌদ্ধ 'মহাযান' ধর্মমতের প্লাবনে গৌড়বঙ্গে ব্রহ্মণ্যধর্মের মহিমা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। খৃষ্টীয় অষ্টম থেকে একাদশ শতকের কোন এক সময়ে কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে এলেন। তখন আদিশূরের রাজত্ব চলছে। বাংলাদেশে আবার ব্রহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এই পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন হলো। এই 'পঞ্চব্রাহ্মণ' হলেন শাণ্ডিল্য-গোত্রের ক্ষিতীশ, বাৎস্য-গোত্রের সুধানিধি, সাবর্ণ-গোত্রের সৌভরি, ভরদ্বাজ-গোত্রের মেধাতিথি আর কাশ্যপ-গোত্রের বীতরাগ। এঁদেরই পাঁচ ছেলের নাম ভট্টনারায়ণ, ছান্দড়, বেদগর্ভ, শ্রীহর্ষ ও দক্ষ। এঁরাই হলেন বাংলাদেশের ব্রাহ্মণকুলের পূর্বপুরুষ।

ভট্টনারায়ণের ছেলে দীন। মহারাজ ক্ষিতিশূর দীনকে 'কুশ' গ্রাম (বর্দ্ধমান জেলা) দান করেন। দীন সেই থেকে 'দীনকুশারি' নামে বিখ্যাত হলেন। দীন কুশারির আট অথবা দশ পুরুষ পরে জগন্নাথ কুশারি। তিনি ছিলেন 'পিঠাভোগে'র জমিদার। এঁর থেকেই 'ঠাকুর'কুলের উদ্ভব।

জগন্নাথ কুশারির মেজো ছেলে পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তমের প্রপৌত্র রামানন্দ। জ্ঞাতিদের মন-কষাকষি আর ঝগড়াঝাঁটিতে উত্যক্ত হয়ে নিজেদের গ্রাম 'বারোপাড়া' ত্যাগ করে রামানন্দের দুই ছেলে মহেশ্বর আর শুকদেব 'কলিকাতা' গ্রামের দক্ষিণে 'গোবিন্দপুরে' এসে নূতন বসতি করলেন। কলিকাতা ও সুতানুটিতে তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের জমজমাট অবস্থা সুরু হয়েছে। ইংরেজরাও কলিকাতায় এসে বাস করছেন। মহেশ্বরের ছেলে পঞ্চানন আর ভাই শুকদেব এসে আদিগঙ্গার তীরে বাড়ি করলেন। কলিকাতায় আদিগঙ্গার তীরে তখন বেশিরভাগ লোকই ছিল জেলে, মালো, কৈবর্ত্ত আর পুণ্ড্রবণিক। এরাই নূতন ব্রাহ্মণদের বসতির সব ব্যবস্থা করে দিল। এরা সবাই কুশারিদের 'ঠাকুর' বলে ডাকতে সুরু করল। পঞ্চানন কুশারি অবশেষে 'পঞ্চানন ঠাকুর' নামেই বিখ্যাত হলেন। এই সময়ে আদিগঙ্গার মুখে যে সব বিলিতি জাহাজ আসত, সেগুলির রকমারি রসদ জোগাতেন পঞ্চানন। জাহাজের কাগজ-পত্রেও তাঁকে 'পঞ্চানন ঠাকুর' বলেই উল্লেখ করা হতো। সেই থেকে কুশারি পরিবারের নূতন উপাধি 'ঠাকুর' ('Tagoure' অথবা 'Tagorc') প্রচলিত হলো। পঞ্চানন ঠাকুরের দুই ছেলে, জয়রাম ও রামসন্তোষ। এঁরা কিছু কিছু ইংরেজি শিখেছিলেন। এঁরা কোম্পানীর (East India Company)

কাজ করে অনেক অর্থ উপার্জন করেন। জয়রামের চার ছেলে—আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম। জয়রামের মৃত্যু হয় ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে। এর পরের বছরই, অর্থাৎ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের ইতিহাসের নূতন অধ্যায় সুরু হলো।

জয়রামের বড়ছেলে নীলমণি ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা গ্রামের পাথুরেঘাটায় বসবাস আরম্ভ করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানি পেলেন, একথা তোমরা তো ইতিহাসেই পড়েছো। কোম্পানী দেওয়ানি পেয়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য নূতন ব্যবস্থা করলেন। নীলমণি এই বিভাগে সেরেস্তাদারের পদ পেয়ে উড়িষ্যায় গেলেন। মেজোভাই দর্পনারায়ণ পাথুরেঘাটার বাড়ির দেখাশোনা করতেন। এঁরা দুই ভাইই প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এঁরা আলাদা হয়ে গেলেন। নীলমণি নগদ একলক্ষ টাকা নিয়ে পাথুরেঘাটার বাড়ি ও সম্পত্তির অংশ ছোট ভাইদের ছেড়ে দিলেন। দর্পনারায়ণ হলেন পাথুরেঘাটার ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবার প্রতিষ্ঠা করলেন নীলমণি ঠাকুর। জোড়াবাগানের বৈষ্ণবচরণ শেঠ এখনকার জোড়াসাঁকোর একবিঘা জমি দেবত্র দেন নীলমণিকে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাস থেকে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর পরিবারের বসবাস সুরু হলো। নীলমণির মৃত্যু হয় এর সাত বছর পরে, ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে।

নীলমণি ঠাকুরের তিন ছেলে রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ। রামলোচনের জন্ম ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে। রামমণির জন্ম হয় ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে। রামমণির দুই স্ত্রী ছিলেন, মেনকাদেবী ও গঙ্গাদেবী। রামলোচনের ছেলে ছিল না। সেজন্য রামলোচন রামমণি ও মেনকা দেবীর ছেলে দ্বারকানাথকে 'দত্তক' নিলেন। রামলোচনের চেষ্টায় ও বুদ্ধিতে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির বিষয়-আশয় অনেক গুণে বেড়েছিল। সেযুগে রামলোচন ছিলেন কলকাতায় এক বিশিষ্ট অভিজাত ও বিদগ্ধ (Cultured) ভদ্রলোক। রামলোচনের স্ত্রী অলকাদেবীও তাঁর উদারতা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রামলোচনের মৃত্যুর পর অলকাদেবী ও রামমণির বড় ছেলে রাধানাথ ঠাকুরবাড়ির বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত নাম। এঁর জন্ম হয় ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে। দ্বারকানাথ পারসী ও ইংরাজী খুব ভাল জানতেন। ইনি একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ছিলেন। পৈত্রিক জমিদারী ও নানারকম ব্যবসা দ্বারকনাথ খুব সুষ্ঠুভাবেই পরিচালনা করতেন। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি চব্বিশপরগণার কালেকটার ও নিম্‌কি অধ্যক্ষের (Salt Agent) দেওয়ান নিযুক্ত হন। দ্বারকানাথ ছিলেন 'কার-ঠাকুর কোম্পানির' প্রতিষ্ঠাতা। কলকাতা শহরের নানা জনহিতকর কাজেও তিনি যুক্ত ছিলেন। হিন্দু কলেজ (এখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজ), মেডিক্যাল কলেজ ও জমিদার সভা স্থাপন করার ব্যাপারে দ্বারকানাথ অনেক সাহায্য করেছিলেন। এছাড়াও সতীদাহ নিবারণ, মুদ্রাযন্ত্রের

(Press) স্বাধীনতা, ডাক চলাচলের সুব্যবস্থা, ইত্যাদি নানারকম সমাজহিতকর কাজে দ্বারকানাথের অপরিসীম উৎসাহ ছিল। দ্বারকানাথ দু'বার বিলাত গিয়েছিলেন। প্রথমবার ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয়বার যান ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে। একশ বছর আগে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের কোন ব্যক্তির পক্ষে সমুদ্রযাত্রা করে বিলাত যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। অবশ্য দ্বারকানাথ ছিলেন কুসংস্কার মুক্ত। দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর দেখে বিলাতে দ্বারকানাথকে সবাই 'প্রিন্স দ্বারকানাথ বলত। ইংলণ্ডেই মাত্র একান্ন বছর বয়সে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়।

—দুই

প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র হলেন রবীন্দ্রনাথ। আজ থেকে ১০৮ বছর আগে জোড়াসাঁকোর ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। সে দিনটি তোমাদের অপরিচিত নয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে। বাংলা ১২৬৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ। সেদিন ছিল কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি। বিশ্বকবি পৃথিবীর প্রথম পরিচয় পেলেন সোমবার মাঝরাতের পর। ইংরাজী মতে এই জন্মদিন গণনা করা উচিত মঙ্গলবার। কারণ ইংরাজী মতে রাত বারোটার পরেই অন্য দিন সুরু হয়ে যায়। এই ২৫শে বৈশাখ দিনটিকে কবি নানা কবিতায় আর গানে বারবার করে স্মরণ করেছেন।

ছেলেবেলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—'আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড় বের করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর গাড়ি। তখন কাজের এত বেশী হাঁসফাসানি ছিল না। রয়ে-বসে দিন চলতো। বাবুরা আফিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ বা পাল্কি চড়ে, কেউ বা ভাগের গাড়িতে। * * * * মেয়েদের বাইরে যাওয়া আসা ছিল দরজাবন্ধ পাল্কির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে। * * * * বড়-মানুষের ঝি-বউদের পাল্কির উপরে আরও একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হতো যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলতো পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল * * * পার্বনের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পাল্কিশুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা। * * * তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি। * * * সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো।”

তখন থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল এক বিশিষ্ট কৃষ্টিসম্পন্ন অভিজাত জমিদারবাড়ি। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়ি সম্বন্ধে বলেছিলেন—“যে সংসারে আমি চোখ মেলেছিলুম, সে ছিল অতি নিভৃত। * * * আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার, অনুশাসন, ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

"আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেককালের বাড়ি, * * * পূর্বযুগের নানা পালপার্বনের পর্যায় নানা কলরবে, সাজে সজ্জায় তার মধ্য দিয়ে এতকাল চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতির বাইরেও পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতনকাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নূতনকাল সবে এসে নামল। * * * আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।"

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ঠাকুরমা 'অলকাদেবীকে' অত্যন্ত ভালবাসতেন। ইনি ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথের বড় ছেলে। পিতামহী অলকাদেবীর মৃত্যু দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এক নূতন ধারা এনে দিল। মহর্ষিদেব তাঁর আত্মচরিতে একথা উল্লেখ করেছেন। এই সময় থেকেই অধ্যাত্মচেতনা ও ঈশ্বরভক্তি দেবেন্দ্রনাথের জীবনকে এক নূতন পথে নিয়ে গেল।

দেবেন্দ্রনাথ বিখ্যাত 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা' ও 'তত্ত্বোধিনী সভার' প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১২৫০ সালের ৭ই পৌষ (ইংরাজী ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর) ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

দেবেন্দ্রনাথের বিয়ে হয় মাত্র বারো বছর বয়সে। স্ত্রী সারদাদেবীর বয়স তখন মাত্রই ছয় কি সাত। দেবেন্দ্রনাথের পনেরোটি সন্তান। তাঁর ছেলে মেয়েদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০—১৯২৬), সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২—১৯২৩), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯—১৯২৫), ও স্বর্ণকুমারী (১৮৫৬—১৯৩২) বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত বিরাজ করছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পিতার অষ্টম পুত্র। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর পিতার সাধনার প্রভাব পড়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা বালক বয়সেই কবির মনে যে সুনিবিড় ছাপ ফেলেছিল, তার পরিচয় তাঁর অনেক লেখাতেই পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় মহর্ষিদেব প্রায়ই হিমালয় পাহাড়ে থাকতেন। এজন্য একেবারে ছেলেবেলায় পিতাকে প্রায় চিনতেনই না কবি। মাঝে মাঝে যখন মহর্ষিদেব কলকাতায় আসতেন তখন "তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গম্‌গম্ করিতে থাকিত। দেখিতাম, গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে, তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান্ হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোন ত্রুটি হয়, এইজন্য মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। রবীন্দ্রনাথের খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও, তাঁর ঘরোয়া কথায় 'কর্তাদাদামশাইয়ের' (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) সম্বন্ধে লিখেছেন—"কর্তাদাদামশায়ের সর্ব-প্রথম চেহারাটি আমার মনে পড়ে, আমার অতি বালককালে দেখা। * * * কর্তাদাদামশায় এলেন, একখানি ফার্স্ট ক্লাশ ঠিকে গাড়ীতে। উনি যখন আসতেন, কাউকে খবর দিতেন না, ওইরকম হঠাৎ এসে পড়তেন। সকালবেলা বাড়ির সবাই তখনও ঘুমোচ্ছে। এর আগে

আমরা তাঁকে কখনো দেখি নি। * * * কর্তাদাদামশায় গাড়ি থেকে নামলেন। লম্বা পুরুষ, সাদা বেশ। বাড়িতে সাড়া পড়ে গেল, সবাই তটস্থ * * * বাড়ির সরকার, কর্মচারী সবাই এসে তাঁকে পেন্নাম করছে, আমার কী খেয়াল হল, আমিও সেই ধুলোকাদামাখা জামা কাপড়েই ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে এক পেন্নাম। কর্তাদাদামশায় আমার মাথায় দু-তিনবার হাতচাপড়া দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।”

প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ। অজস্র ঐশ্বর্য ও সমারোহের মধ্যেই বড় হয়েছিলেন। কিন্তু টাকাকড়ি, বিষয়-সম্পত্তি কোন কিছু সম্বন্ধেই তাঁর কোন মোহ অথবা আসক্তি ছিল না। অথচ নিরাসক্ত হয়েও নিপুণভাবেই তিনি বিষয়-সম্পত্তি ও হিসাব-পত্র দেখতেন। রীতিমত দপ্তরখানায় কাজ শিখেছেন তিনি। তাছাড়াও, তাঁর স্বভাবের মধ্যেই কোথাও কোন ঢিলেমি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ পিতার সম্বন্ধে বলেছেন—“ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোন জিনিস ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার কাজেও যেমন তেমন করিয়া কিছু হইবার যো ছিল না। তাঁহার প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি তাঁহার সমস্ত কর্তব্য অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ছিল।”

প্রিন্স দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর দেখা গেল, দ্বারকানাথ অনেক ঋণ রেখে গিয়েছেন। ইচ্ছা করলে দেবেন্দ্রনাথ যে এই ঋণ এড়াতে পারতেন না, তা নয়। কিন্তু তিনি সর্ব্বস্ব দিয়ে পিতৃঋণ পরিশোধ করলেন। তাঁর সততা দেখে পাওনাদারেরা অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে তাঁদের খুব সাদাসিধেভাবে সংসার চালাতে হত। পারিবারিক খরচ-পত্র নানারকমভাবে কমিয়ে দেওয়া হল।

একবার ‘কল্পতরু’ হলেন দেবেন্দ্রনাথ। ‘কল্পতরু’ মানে নিজের সব কিছু দান করা। “সারা বাড়ির লোক এসে ওঁর সামনে জড়ো হল।···কেউ নিলে ঘড়ি, কেউ নিলে আয়না, কেউ নিলে টেবিল—যে যা পারলে নিয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে ঘর খালি হয়ে গেল।”

অল্প বয়সে দেবেন্দ্রনাথের নানারকম শখ ছিল। কালোয়াতি গান শিখেছেন। পিয়ানো শিখেছেন সাহেব মাস্টারের কাছে।

খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসতেন তিনি। ‘পায়েস’ ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়।

একটা গল্প শোনো। একবার ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজনকে নিয়ে মহর্ষিদেব চাঁপদানির বাগানে গিয়েছেন। সারাদিন থাকা হবে। সকালে উপাসনার পর সেখানেই রান্না করা হল। দেবেন্দ্রনাথ নিজে পায়েস রেঁধেছেন। মহানন্দে সকলে মিলে খেতে বসা হল। সব খাওয়া শেষ হল। এবার পায়েস। কিন্তু কি আশ্চর্য! একটুখানি মাত্র পায়েস মুখে ঠেকিয়ে কেউ আর কিছু বলেন না। অথচ ভাল করে খেতেও পারছেন না। কি ব্যাপার ? দেবেন্দ্রনাথ জনে জনে জিজ্ঞেস করলেন—

“কী, কেমন হয়েছে পায়েস, ভালো হয়েছে তো ?

সবাই ঘাড় নাড়লেন। পায়েস চমৎকার হয়েছে।

তাঁদেরই মধ্যে কে একজন বলে ফেললেন—আজ্ঞে ভালই হয়েছে তবে একটু ধোঁয়ার গন্ধ।

কর্তাদাদামশায় বললেন—ধোঁয়ার গন্ধ হয়েছে তো, ওইটিই আমি চাইছিলুম, আমি আবার পায়েসে একটু ধোঁয়াটে গন্ধ পছন্দ করি কি না।"

আসলে পায়েস ধরে গিয়েছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এই নিয়েই একটু রঙ্গ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপনয়নের সময় থেকে পিতার সঙ্গ খুব ঘনিষ্ঠভাবেই পেয়েছিলেন। উপনয়নের পর তিনি পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রা করলেন। "বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার সময় পিতা তাঁহার চিররীতি অনুসারে বাড়ির সকলকে দালানে লইয়া উপাসনা করিলেন। গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া পিতার সঙ্গে গাড়িতে চড়িলাম। আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোষাক তৈরী হইয়াছে। কী রঙের কিরূপ কাপড়' হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। মাথার জন্য একটা জরির কাজ করা গোল মখমলের টুপি হইয়াছিল।"

পিতার সঙ্গে বাইরে যাত্রা বালক রবির মনকে পরবর্তী কালের জন্য নানাভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত]

ডানপিটে

বেলা দেবী

ডানপিটে বলে কেউ করে না আদর
মা বলেন বাবলুটা গাছের বাঁদর।
'পড়াশুনো নেই?' বলে বাবা ধমকান
কথায় কথায় দাদা কষে টানে কান।
সেদিন তুতুনসোনা ডুবে গেল জলে
হায় হায় কান্না জুড়লো সকলে।
ভয়ে কেউ নামে না কো, শোনা মাত্তর
বাবলু ঝাঁপিয়ে পড়ে নেই ভয় ডর।
বাঁচল তুতুন, সবে আবেগ বিহ্বল
গৌরবে মা-বাবারও চোখে ঝরে জল।

নববর্ষের উৎসব

॥ স্বপনবুড়ো ॥

পিনটু তার দলবল নিয়ে বছরের শেষের দিনে বেরিয়েছে —চাঁদা তোলবার জন্যে।

আজ চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা নদীর ধারে। প্রতি বছরই এই মেলা বসে থাকে—এই নদীর কিনারে। বহু লোক নৌকো করে এই চৈত্র-সংক্রান্তির মেলায় আসে—বিকিকিনি করতে।

পিনটুরা চাঁদা তুলবে—আগামীকাল যে নববর্ষ উৎসব করবে— তারই জন্যে।

দূর দূর অঞ্চল থেকে কত রকম মানুষ কত নমুনার নৌকোয় চেপে কত রকম সওদা নিয়ে এসে হাজির হয়—এই মেলায় বিক্রী করবে বলে।

তাই নদীর ধারে যেন মানুষ থৈ-থৈ করে। শুধু কালো কালো মানুষের মাথা।

সওদাই বা আসে কত রকমের।

কেউ নৌকো বোঝাই করে নিয়ে আসে তরমুজ, ফুটি, আরো সব ফল—যা গরমকালে ফলে।

এক-একটা নৌকো আবার খেলনায় ভর্তি থাকে। মাটির তৈরী খেলনা, টিনের খেলনা, এমনি আরো কত রকমের খেলনা, আর তাদের রঙের বাহারই বা কত।

কত নৌকো আসে—তারা নদীর কিনারে টিনের ঘর তুলে কেবল তেলেভাজা আর গরম জিলিপি তৈরী করে।

যত ছেলেমেয়ের দল হাতে-গরম খাবারের জন্যে সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

আবার হাঁড়ি হাঁড়ি গুড় নিয়ে আসে কত নৌকো। দেখে মনে হয়—এত গুড় খাবে কে ?

এ-ছাড়া বাসনের নৌকো, কাপড়ের নৌকো, মেয়েদের সৌখীন চুড়ি আর শাঁখার নৌকো, কলার নৌকো, মাছের নৌকো, হাঁড়ি-কুঁজো-কলসী ভর্ত্তী নৌকো···কত নাম করা যায় বলো ?

এরা সবাই নৌকো থেকে সওদা নামিয়ে নদীর ধারে ধারে দোকান সাজিয়ে বসে। এই চৈত্র-সংক্রান্তির মেলায় প্রচুর বিকিকিনি হয়। নৌকো ভর্ত্তী করে যারা আসে তারা নৌকো খালি করে আর ট্যাঁক বোঝাই করে ঘরে ফিরে যায়।

পিনটুদের কাজ হচ্ছে - মেলার এই সব দোকান থেকে চাঁদা আদায় করা।

ছেলেরা দল বেঁধে যায়, কাজেই দোকানীরা চাঁদা দিতে বিশেষ আপত্তি করে না।

যে বছর বেচা-কেনা ভালো হয়, দোকানীরা খুশী মনেই একটা করে সিকি চাঁদা দেয় ছেলেদের। এইভাবে প্রতিটি দোকান থেকে চাঁদা আদায় করে নেহাৎ কম টাকা ওঠে না।

ছেলের দল প্রতি বছর সেই টাকা নিয়ে মহা ধুমধাম করে "নববর্ষ উৎসব" সমাপন করে থাকে। এই নববর্ষ উৎসবে গান-বাজনা, আবৃত্তি, খেলাধূলা, খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়। কোনোবার যদি বেশী টাকা আদায় হয় তা'হলে গ্রামের যাত্রাদলকে ধরে এনে মোটামুটি কম খরচে এক পালা যাত্রাগানও দিব্যি জমে ওঠে।

যাত্রাগানের আয়োজন হলে সারা গাঁয়ের মানুষ এসে খোলা মাঠে পাশাপাশি বসে সারারাত ধরে আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

কংসের হুঙ্কার, রাধা-কৃষ্ণের গান, শিবাজীর দেশপ্রেম, কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ···কোন্ পালা নিয়ে আসর জমে উঠবে,—সেটা কেউ বলতে পারে না। তাই সকলেরই ঝোঁক এই যাত্রাগানের দিকে।

পিনটুরাও তাই ঠিক করেছিল যে, এবার বেশী টাকা তুলতে হবে। তা'হলেই যাত্রাগানের আসর বসাতে পারবে।

অনেক সময় কোন পালা গাওয়া হবে—তাই নিয়ে ছেলেদের মধ্যে প্রথমে আলোচনা, তারপর কথা কাটাকাটি তারপর উত্তেজনায় আস্ফালন, অবশেষে মাথা ফাটাফাটি অবধি হয়ে যায়।

কিন্তু যাত্রাগানের জনপ্রিয়তা তাতে এতটুকু কমে না, বরং বেড়েই চলে।

দোকানীর দলও চাঁদা দেবার সময় আগে ছেলেদের শুধোয়,—যাত্রাগান হবে নাকি দাদাবাবুরা ? যেবার যাত্রাগানের কথা শোনে, দোকানীরা আপনা থেকেই উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

চাঁদাও সে বছর বেশী ওঠে।

দোকানীরাও সদলবলে নৌকো বোঝাই দিয়ে এসে সারারাত জেগে যাত্রা শোনে।

এ-বছরও পিনটুর দল দোকানে দোকানে যাত্রাগানের কথা বলে অল্প সময়ের ভেতরই বেশ চাঁদা তুলে ফেললে।

ছেলের দলের মন তাই খুব খুশী।

পিনটুর বন্ধুরা বললে—পিনটু, এতগুলো টাকা নিয়ে মেলার ভেতর ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়। পকেটকাটার দল ওৎপেতেই আছে। টাকার থলিটা নিয়ে তুই বরং এখুনি বাড়ী ফিরে যা—

পিনটু অবাক হয়ে শুধোলে—কিন্তু তোরা এখন কি করবি ?

ছেলের দল বললে—কালকের নববর্ষ উৎসবের জন্য আমরা টুকিটাকি কিছু বাজার করে নিয়ে যাই। কিছু ফলফুলুরী কিনতে হবে। সরবৎ করার জন্যে কয়েক বোতল সিরাপ নিতে হবে। আরো কিছু খুচরো বাজার আজকেই সেরে ফেলতে হবে।

পিনটু বললে—তাহলে টাকার থলি নিয়ে আমি সরাসরি বাড়ী ফিরে যাবো বলছিস ?

ছেলেদের মধ্যে একজন বললে—হ্যাঁ, মেলার ভীড়ে আর ঘোরাঘুরি করিস নি। পকেটকাটার দল ভারী শেয়ানা। বাড়ী ফিরে টাকার থলেটা তোর ঠাকুমার কাছে সাবধানে রেখে দিবি।

এই বলে বন্ধুর দল খুচরো বাজারটা সেরে নিতে মেলার ভীড়ের মধ্যে ঢুকে গেল।

পিনটুও টাকার থলেটা কোচার খুঁটে লুকিয়ে বাড়ীর দিকে হনহন করে রওনা দিলে।

মনে যে একটু ভয় নেই, সেকথা জোর করে বলা চলে না। হাজার হোক—এতগুলি কাঁচা পয়সা সঙ্গে! বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো।

পিনটুর একবার মনে হল, আর দু'একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এলেই হত! তাহলে মনের এই ভয়-ভয় ভাবটা নিশ্চয়ই থাকতো না।

কিন্তু এখন আর সে-কথা ভেবে কোনো লাভ নেই। বন্ধুরা সব মেলার ভীড়ে মিলিয়ে গেছে। তাদের আবার খুঁজে বের করতে গেলে অন্য বিপদ ঘটতে পারে!

মানুষের মনে ভয় হলে, মুখে আপনা থেকেই গুণ গুণ করে গান জাগে।

পিনটু মাথা নেড়ে আপন মনেই গান গাইতে গাইতে এগিয়ে গেল।

গরমের দিন হলেও দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। তাই রোদের তেজটা গায়ে পুরোপুরি লাগছে না। পিনটু আপন মনে ভাবতে লাগলো,—যাত্রাটা এবার তাহলে ভালই জমবে। কিন্তু যুদ্ধ আর মারামারি কাটাকাটি না থাকলে যাত্রা জমে না! এবার কি পালা হলে ভালো হয়—সেই কথা ভাবতে ভাবতে সে অনেকটা পথ পেরিয়ে এলো।

পথের পাশে একটা মস্তবড় বটগাছ। দিব্যি ছায়া শীতল নিরিবিলি জায়গাটা।

এইখানে চুপচাপ খানিকটা জিরিয়ে নিলে মন্দ হয় না।

একটা লোক এক বোঝা আখ নিয়ে সেই বটগাছের ছায়ায় বসে পড়েছে,—আর গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছছে। লোকটা বোধকরি অনেক দূর থেকে আসছে। রদ্দুরের তাপে তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই মেলায় যাচ্ছে আখ বিক্রী করতে। পিনটু সেই লোকটার কাছ থেকে একটা আখ কিনে চিবুতে লাগলো। শীতল বটের ছায়া, ঝির ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে। আখ চিবুতে চিবুতে যেন ঘুমের আমেজ এসে গেল।

পিনটুর দুই চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো।

হঠাৎ একটা বুক ফাটা চীৎকারে পিনটুর চট্‌কা ভেঙে গেল।

না—না, এখানে এ-ভাবে ঘুমিয়ে পড়া তার ঠিক হয় নি। যে লোকটা আখের আঁটি নিয়ে বসে আছে, তার মনে কি আছে কে জানে!

চোখ দুটো কচলে নিয়ে সে চারদিকে একবার তাকালো।

তাইত! বটগাছ থেকে একটু দূরে ওই ঝোপের ধারে বসে এমন করে মাথা কুটে কে কাঁদে?

পিনটুর কৌতূহলী মন। একটু এগিয়ে দেখতে গেল।

তাইত! এ যে ওদের গয়লাবৌ, ভিখুর মা! ভিখুর মা এমন সময় ঝোপের ধারে বসে কাঁদছে কেন?

আরো দু'পা এগিয়ে গেল পিনটু।

ভিখুটাও যে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। ওর ছেঁড়া কাপড়টা একেবারে ময়লায় মাখামাখি।

কি অসুখ করল ভিখুর—পিনটু বুঝতে পারল না! গয়লাবৌয়ের কাতর আর্তনাদ শুনে সেই লোকটা আখের বোঝা ফেলে ওকে দেখতে গেল।

ভালো করে অনেকক্ষণ ধরে ভিখুটাকে দেখে সেই চাষী লোকটা বললে—সর্বনাশ দাদাবাবু, এ ছোঁড়াটার যে ওলাউটো হয়েছে। দেখছ না, ময়লা দিয়ে কাপড় একেবারে মাখামাখি।

তারপর আর একটু ভালো করে দেখে বললে—ইস্! বমিও ত' করেছে অনেকখানি।

ওদিকে ভিখুর মা সমানে কান্নাকাটি করছিল আর মাথা খুঁড়ছিল, আমার ভিখুটাকে বাঁচাও তোমরা—আমাদের দেখবার কেউ নেই···

পিনটু ভয়ে-ভয়ে সেই চাষী লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে—এখন কি করা যায় বলত' চাষী ভাই?

চাষী বললে—কাছেই একটা হাসপাতাল আছে। সেখানে যদি কোনোরকমে ধরাধার করে নিয়ে যাওয়া যেত।

পিনটু দোটানায় পড়ল।

এদিকে সঙ্গে এতগুলো টাকা! ওদিকে ওদের গয়লানীর ছেলে ভিখুর এমন প্রাণ নিয়ে টানাটানি! তাকে এভাবে ফেলেও ত' চলে যাওয়া যায় না।

চাষীটার দিকে আর একবার তাকালো পিনটু। ধীরে ধীরে বললে—তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

চাষী বললে—কেন যাবো না বাবু? ছোঁড়াটা এমন করে বেঘোরে মরতে বসেছে। চলো, দু'জনে মিলে ধরাধরি করে—

পিনটু শুধোলে—কিন্তু তোমার ওই আখের বোঝা? নিশ্চয়ই তুমি মেলায় যাচ্ছিলে?

চাষীটা উত্তর দিলে—রইল পড়ে আখের বোঝা। মানুষের পরাণের চেয়ে ত' আমার এই আখের দাম আর বেশী নয়! গায়ে-গতরে খাটতে পারলে, অমন কত আখ আমার খেতে ফলবে। চল দাদাবাবু, আর দেরী করলে ছোঁড়াটাকে হয়ত এ যাত্রা বাঁচানোই যাবে না।

তখন দুইজনে এগিয়ে গেল ঝোপটার দিকে। ধরাধরি করে ভিখুটাকে সদর রাস্তার ধারে এনে ফেললো।

হঠাৎ দেখা গেল, একটা গরুর গাড়ী সেই দিকপানে আসছে।

চাষী ভাই হাত তুলে চেঁচিয়ে বললে—ও মাইতির পো, শীগ্‌গির এদিকপানে এসো। একটা

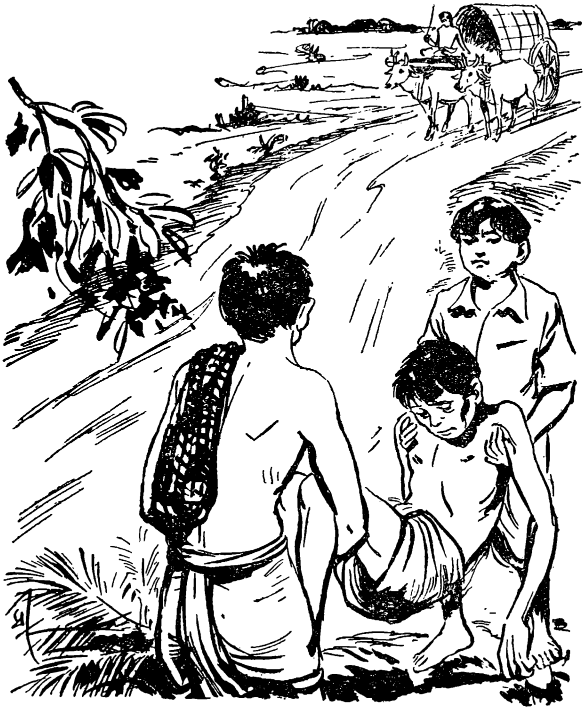

ছোঁড়া বেঘোরে মরতে বসেছে। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

চাষী ভাইয়ের হাঁক শুনে সেই লোকটা তাড়াতাড়ি গাড়ী নিয়ে এসে হাজির হল। কোনো রকম আপত্তি না করে সে ভিখুকে গাড়ীতে তোলবার জন্য ওদের সঙ্গে হাত মেলালো।

ভিখুর মাও কাঁদতে কাঁদতে সেই গরুর গাড়ীতে উঠে বসল।

তখন সেই মাইতি গরুর ল্যাজ মলে দিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ী ছুটিয়ে দিলে হাসপাতালের দিকে।

পিনটু মনে মনে ভাবলে—ওরা যাদের চাষা ভেবে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যাদের ওরা মানুষ বলে মনেই করে না, তারাই হচ্ছে সত্যিকারের দরদী মানুষ। ওদের বুকেই বুঝি প্রাণের ঠাকুর বাসা বেঁধে আছে। ছেলেরা দল বেঁধে এখানে থাকলে—নিশ্চয়ই এই ঝামেলায় নিজেদের না জড়িয়ে—দিব্যি পাশকাটিয়ে চলে যেতো।

পিনটুর নিজেকে ভারী ছোট মনে হতে লাগলো। এই চাষীদের মন যে এত উদার, এক গাঁয়ে বাস করেও পিনটু তা আগে জানতে পারে নি। তারপর ওরা তিন জনে মিলে ভিখুকে অনেক কষ্টে হাসপাতালে ভর্তী করে দিলে।

ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে বললেন—রোগটা খুব সাঙ্গাতিক! এক্ষুণি ইন্‌জেক্‌সন দিতে হবে; স্যালাইনের ব্যবস্থা করতে হবে। সারাদিন রাতের জন্য নার্স রাখতে হবে। বেশ কিছু টাকার দরকার।

তিনি ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কি টাকার ব্যবস্থা করতে পারবে?

হঠাৎ কি জানি কেন পিনটুর মনে হল—ওরা ভিখুকে বাঁচাবার জন্তেই সারা মেলায় ঘুরে ঘুরে এই চাঁদা তুলেছে।

ওর মনে তখন এতটুকু আর দ্বিধা নেই। কোঁচার খুঁটে লুকোনো টাকার থলেটা ডাক্তারবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বললে—ডাক্তারবাবু, আপনি ভিখুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। ওকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে।

তিন জন অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে রইল সেই হাসপাতালের বারান্দায়।

আঁধার ঘনিয়ে এলো।

কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই।

মনে হল, ওরা তিনটি প্রাণী ক্ষিদে-তেষ্টাও বুঝি ভুলে বসে আছে।

অনেক রাত্তিরে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এসে বললেন—ছেলেটার আর প্রাণের ভয় নেই। রাতও অনেক হয়েছে, এইবার তোমরা বাড়ী যাও। কাল সকালে এসে খোঁজ নিও।

তিন জনের মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু বুক যেন ওদের একটা পরম শান্তিতে ভরে আছে।

আকাশের লক্ষ লক্ষ তারা যেন ওদের দিকে তাকিযে আছে।

বাড়ীতে ফিরে এসে পিনটু শুনলো—তার বন্ধুরা অনেকবার এসে তাকে খুঁজে গেছে। কাল সকালে আবার আসবে।

পিনটু সারাদিনের হয়রানিতে খুবই ক্লান্ত ছিল। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে।

শেষ রাত্তিরে পিনটু স্বপ্ন দেখলে—একটি ফুটফুটে ছোট্ট ছেলে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

পিনটু শুধোলে—তুমি কে?

ফুটফুটে ছেলেটি বললে—আমি নববর্ষ। তোমার নববর্ষ-উৎসবই সকলের চেয়ে সেরা হয়েছে। সেই ফুটফুটে ছোট্ট ছেলেটির পাশে চাষী ভাই আর মাইতি ভাইয়ের মুখ দুটিও শুকতারার মতো ফুটে উঠল।

পিনটু অবাক হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। ততক্ষণে ভোরের পাখী পিনটুদের বাগানে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে।

কবিপুত্র শমীন্দ্রনাথ, কন্যা-মাধুরীলতা, রেণুকা ও মীরা

সুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

কবির পাঁচটি ছেলেমেয়ে—প্রথম সন্তান, কন্যা মাধুরীলতা (বেলা) দ্বিতীয় সন্তান, পুত্র রথীন্দ্রনাথ, তৃতীয় সন্তান, কন্যা রেণুকা (রাণী), চতুর্থ সন্তান, কন্যা মীরা, পঞ্চম সন্তান, সকলের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ।

শমীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। শমীন্দ্রনাথের চেহারা ছিল খুব সুন্দর, লম্বা, ফরসা, অনেকটা কবির মতোই দেখতে। "সে ছিল দৈহিক সৌন্দর্যে পিতারই অনুরূপ, বোধহয় বিকশিত হলে মানসিক সৌন্দর্যেও উত্তরাধিকারী হতে পারত, কারণ অতি শৈশব থেকেই তার কবিতা রচনায় ও বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অসীম আগ্রহ দেখা যায়।" যখন শমীন্দ্রনাথের বয়স ছয় বৎসর তখন কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবী মারা যান। তাই মাতৃস্নেহ লাভ তার ভাগ্যে ঘটে নি। বাবাকে সে অত্যন্ত ভালবাসত। ছোটবেলায় মা হারিয়ে সে বড় অসহায় হয়ে পড়ল। পত্নীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই কবি ছেলেমেয়েদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন। রবীন্দ্রনাথ থাকতেন 'দেহলীতে' তার সংলগ্ন নূতন বাড়ীতে তাঁরা ভাই-বোন রাজলক্ষ্মী দিদিমার স্নেহে ও যত্নে প্রতিপালিত হতে লাগলো। রাত্রে শমী মায়ের কাছে শুতো। কিন্তু কবি ছোটো শিশু নিয়ে শুতে পারতেন না। নিজের খাটের কাছে তার খাট টেনে নিয়ে শুতেন। রাত্রে ঘুমেরঘোরে সে মা মা বলে ডেকে উঠত। রাত্রে মাকে খুঁজলে, মা বলে ডেকে উঠলে কবি তার হাতটি ধরে থাকতেন। মা হারিয়ে শিশু সমী মায়ের জন্য কেঁদে উঠত। কবি তাকে কোলে করে আদর করে মায়ের দুঃখ ভোলাতে চেষ্টা করতেন। তার জন্য তিনি 'শিশু' বইয়ের অনেক কবিতা লিখেছিলেন। কবি বলতেন—"সে ছন্দ ভালবাসত, সে যদি থাকত সে আমার মতো হতো।" কবিতাগুলির নায়ক ছিল খোকা। এই খোকাই হলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সমীন্দ্র। এই পুত্রই যে এই কবিতাগুলির নায়ক, তার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছেন। পরলোকগতা পত্নীর কোলের সন্তান ছিলেন এই শমীন্দ্র। সুতরাং মায়ের সঙ্গে খোকার একচ্ছত্র ঘনিষ্ঠতাই কবির মনে উজ্জ্বল স্মৃতিরূপে বিরাজ করে, তাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। এই সম্পর্কে তাঁর এক বন্ধুর কাছে লিখিত তাঁর চিঠির অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে : "আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকা নামে।···খোকা এবং খোকার মায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ

মাধুরী— তখন খুকি ছিল না—মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল, সেইজন্য লিখতে গেলেই খোকা ও খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মতো নানা রঙে রাঙিয়ে উঠে,—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলছে তাকে নিবারণ করতে পারি না। "ভারী মর্মস্পর্শী কথা। সুতরাং শিশু সম্বন্ধে রচিত এই কবিতাগুলি পরলোকগত সহধর্মিনীর মাতৃমূর্তির স্মৃতির প্রতি অর্ঘ্যও বটে। কবির মেজো মেয়ে রাণীর কবি-পত্নীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই খুব অসুখ হ'ল। কবি রাণীকে নিয়ে হাজারিবাগ গেলেন। সঙ্গে গেলেন রাজলক্ষ্মী দিদিমা, তাঁদের মামা ও বোন মীরা। শমীন্দ্রনাথ তার দাদা রথীন্দ্রনাথের কাছে 'দহলী'তে রইল। শমীন্দ্রনাথ খুব স্নেহশীল ছিল। দাদাকে অত্যন্ত ভালবাসত। রথীন্দ্রনাথও ভাই শমীন্দ্রনাথকে এত ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন যে সেই স্নেহ-ভালবাসার তুলনা হয় না। দুপুরে শুয়ে কত রকমের কথা, কত রকমের গল্প হত দু'জনায়। অত অল্প বয়সেই তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তার রসগ্রাহী মনের পরিচয় পেয়ে রথীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে চমকে উঠতেন। বড় হলে সে যে কবি হবে, বাবার প্রতিভা তার মধ্যেই প্রকাশ পাবে, তাঁর সন্দেহ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কৃষিবিদ্যা শিখার জন্য, ফিরে এসে, রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকা পাঠালেন। ভাই শমী চিঠি লিখত তাঁর কাছে আশ্রমের খবর দিয়ে। আর লিখত, তার বন্ধুরা কে কী করছে, তার পড়াশুনা কেমন চলছে—এ-ছাড়া কখন কোন্ গাছে কী ফুল ফুটছে, জ্যোৎস্নারাতে কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে, ছাত্রদের সভায় সে কোন্ কবিতা আবৃত্তি করেছে ইত্যাদি নানারকম খবর। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে সে মিষ্টি গলায় গেয়ে উঠত—"তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার।" সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে উচ্ছল হয়ে হাল্কা দেহে আশ্রমময় লাফিয়ে বেড়াত। সে তাদের নূতন বাড়িতে একটি মাধবীলতার গাছ পুতেছিল। তার হাতে লাগানো এই গাছটি ঐ 'নূতন বাড়ির' শোভাবর্ধন করত। সে লতাটি আজ জীবিত।

শমী শিশুকাল থেকেই একটু রুগ্ন ছিল, পেটের অসুখে প্রায়ই ভুগত। তখন শমীন্দ্রের বয়স এগারো বৎসর মাত্র। এক ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে জগদানন্দবাবুকে লিখলেন, শমীন্দ্রকে তার জ্যাঠাইমার কাছে মুঙ্গেরে পৌঁছে দিতে, সেই সময় রবীন্দ্রনাথের আজীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পত্নী ছিলেন মুঙ্গেরে গঙ্গাতীরে। তিনিই ছিলেন শমীন্দ্রের প্রিয় জ্যাঠাইমা। শমীন্দ্র গেল মুঙ্গেরে। সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ তারযোগে খবর পেলেন, শমীর কলেরা হয়েছে। তক্ষণাৎ তিনি তাঁর হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক ওষুধ-পত্রের বাক্স নিয়ে চলে গেলেন মুঙ্গেরে। শান্তিনিকেতনের সকলে উদগ্রীব হয়ে আছে শমীর সংবাদের জন্য। একবার শোনা গেল তার অবস্থা একটু ভালো গুরুদেব তাকে নিয়ে আসবেন শান্তিনিকেতনে। ভৃত্য বনমালী প্রস্তুত হয়ে আছে অসুস্থ ছোটদাদা-বাবুর যথাসম্ভব আরামের সব ব্যবস্থা করে। সকলে উৎকণ্ঠিত শমীকে দেখার আশায়। অনেক রাত্রে গুরুদেবের গাড়ী এসে থামল দেহলির দরজায়। সকলে ঘিরে দাঁড়ালো সে গাড়ি। গাড়ি থেকে

নেমে এলেন একাকী গুরুদেব। নেমে কোন দিকে না তাকিয়ে, একটিও কথা না বলে সোজা চলে গেলেন দেহলির উপর তলায়। তাঁর থমথমে গম্ভীর মুখ দেখে সকলেই বুঝল শমী আর ইহজগতে নেই। শিশু কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির নায়ক, তার মা যেখানে আগে চলে গিয়েছেন, তাঁর অনুগমন করল। শমীর মৃত্যুর খবর কবি রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন। রথীন্দ্রনাথ এই সংবাদে বিমূঢ় হলেন, "হঠাৎ বজ্রঘাতের মতো একদিন বাবার কাছ থেকে এক চিঠি এল শমী আর নেই।...শমী যে নেই, কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারলুম না। আমেরিকা রওনা হবার আগে সে ছুটির সময় আমার কাছ ছাড়া হত না। সে যেন বুঝেছিল আর দেখা হবে না।" অন্তরে যতই আঘাত পান, বাইরে কবি তা কখনো প্রকাশ করতেন না। শমীর মৃত্যুর সময় সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সকলেই আশ্চার্য হয়ে গিয়েছিলেন কী শান্তভাবে কবি তাঁর এই ব্যক্তিগত দুঃখকষ্ট সংবরণ করলেন। কি শান্তভাবে অসীম ধৈর্যসহকারে এই মৃত্যুকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার কাছে লেখা চিঠি থেকে বুঝা যায়—"এসেছি সংসারে, মিলেচি সংসারে, তারপরে আবার কালের টানে সরে যেতে হয়েচে, এমন কতবার হোলো, বারবার হবে—এর সুখ এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠচে।...কত অসহ্য দুঃখ বেদনা ঘরে ঘরে আছে, কাল প্রতিদিন তা একটু একটু করে মুছে মুছে দিচ্ছে। আমার জীবনের উপরেও সেই বিশ্বব্যাপী কালের হাত কাজ করচে, আর সেই জগৎজোড়া আরোগ্যের কাজকে যেন একটুও কঠিন না করি—শোক-দুঃখের চলাচল সহজ হয়ে যাক, প্রাত্যহিক দিনযাত্রাকে বাধা না দিক।...যে রাত্রে শমী চলে গিয়েছিল, সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। শমী যে রাত্রে গেল, তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বললে, কম পড়ে নি সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারই মধ্যে সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে, সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোন সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।"

কবির প্রথমা কন্যা মাধুরীলতা (বেলা)

কবির প্রথমা কন্যা মাধুরীলতার জন্ম হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। তার বয়স যখন প্রায় বারো বৎসর তখন কবি তাকে ও তার আর চার ভাই-বোনদের নিয়ে এলেন কলকাতা থেকে শিলাইদহে। কলকাতার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনধারা থেকে এখানকার জীবনধারা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের বাড়ি খোলা মাঠের মধ্যে। তাদের ছোট বোন রাণী ও মীরা আর ছোট ভাই শমী তখনো নিতান্ত শিশু।

রথীন্দ্রনাথ একটু বড়ো। এই নির্জনতার মধ্যে মাধুরীলতা ও রথীন্দ্রনাথ বাবা ও মাকে আরো কাছাকাছি যেন পেলেন। কবি তখন মাধুরী ও রথীন্দ্রনাথের লেখাপড়া শেখাবার জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ দিলেন।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য কবি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটা স্কুল খুলেছিলেন। সর্বসমেত দশ বারো জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রী হল না। মাধুরী এই স্কুলে পড়েছিলেন। একজন বৃদ্ধ হেড-মাষ্টার দুইজন কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা-প্রণালীতে অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা তাঁদের পড়াতেন। শিক্ষিকাটির অভ্যাস ছিল ক্লাশে বসেই 'Pindrop Silence' বলা। এ-কথা শোনার জন্য তাঁরা ইচ্ছে করেই গোলমাল করতেন। আরো মজা লাগত যখন চৌকন গোল প্রভৃতি বোঝাতে নানান ছড়া বানাতেন। ফুটবল গোল আর রসগোল্লাও গোল বললে সকল ছাত্র-ছাত্রী হেসে ফেলতো। তখন আর Pindrop Silence থাকত না। হেড-মাষ্টার রসময়বাবু দুপুরবেলা হলেই ঘুমুতে আরম্ভ করতেন। তিনি বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে ঢুলতে থাকতেন। মাধুরী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুষ্টু ছিল। কখন নিঃশব্দে পালিয়ে গিয়ে মা'র কাছ থেকে মাছভাজা, বেগুনি প্রভৃতি উপাদেয় নিয়ে এসে সকলের মধ্যে বিতরণ করে তার নিজের জায়গায় চুপচাপ হয়ে বসতো। হঠাৎ জেগে পড়লে হেড-মাষ্টার মশাই দেখতেন একধার থেকে সবগুলো ডেস্ক-এর ডালা তোলা। ডালার আড়ালে ছাত্র-ছাত্রীদের কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। গলা খাঁকরি শুনে ডালা বন্ধ হত এবং যে যার কাজ করে যেত। ডেস্কের মধ্যে অর্ধভুক্ত মাছভাজা তখনকার মতো তোলা থাকত। এইসব খাবারের সঙ্গে মাধুরী দু-একটা সাজাপানও মায়ের ডিবে থেকে চুরি করে আনতো। বেশি বকাঝকা করলে রসময়বাবুকে সেই পান দিয়ে বলতো—"মাষ্টারমশাই চট্ করে ঘরে গিয়ে আপনার জন্য পান নিয়ে এলুম।" হেড-মাষ্টারমশাই আর কিছু বলতেন না।

এই ঘরোয়া ইস্কুলে তাঁদের ভাই-বোনদের হাতেখড়ি হ'ল। শিলাইদহে এসে কবি নিজের তত্ত্বাবধানে তাদের রীতিমতো পড়াশুনা শুরু করে দিলেন। কবি নিজেই তাদের বাংলা পড়াতে লাগলেন। কবি ভালো ভালো কবিতা শুনিয়ে মুখস্থ করতে দিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সব কবিতা তাদের মুখস্থ হয়ে গেল। তারপর বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা পড়ালেন। সংস্কৃত ও ইংরেজি শেখাবার জন্য দু'জন শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। শিবধন বিদ্যার্ণবকে সংস্কৃত পড়াবার জন্য রাখলেন আর মিষ্টার লরেন্সকে রাখলেন ইংরেজি পড়াতে। তাঁর হাতে ইংরেজি ভাষার গোড়াপত্তন তাদের পাকাপাকি হ'ল। কবি মনে করতেন, রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। তিনি তাদের এ-সকল কাহিনীও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করলেন।

শিলাইদহ থাকতে কবি যেমন তাদের লেখাপড়া শেখাবার দিকে নজর দিলেন অন্যদিকে কবি-পত্নী চেষ্টা করতেন তাদের সবরকম ঘরকন্নার কাজ শেখাতে। রবিবারদিন তিনি চাকর-বামুনদের

ছুটি দিয়ে সংসারের সমস্ত কাজ তাঁদের দিয়ে করাতেন। এ-ভাবে শহরের জটিলতা ও কোলাহল থেকে দূরে, প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের মধ্যে ও পিতা-মাতার স্নেহের অন্তরালে তারা কয় ভাই-বোন বড় হতে লাগলো।

ভাই-বোনদের মধ্যে মাধুরী ছিলেন সকলের বড়ো। তিনি ও রথীন্দ্রনাথ দু'জনে পিঠাপিঠি ছিলেন বলে রথীন্দ্রনাথ তাঁকে সমবয়সী মনে করতেন। তাঁকে তাঁর ডাকনাম 'বেলা' বলে ডাকতেন। তাঁর বিয়ে হয়ে গেলে মা রথীন্দ্রনাথকে ধমক দিয়ে বললেন—"এখন কখ্খনো আর ওকে নাম ধরে ডাকবিনে, "দিদি" বলবি। যদিও তখন থেকে রথীন্দ্র তাঁকে দিদি বলে ডাকতে লাগলেন। তবু তাঁরা দু'জনের কারো সেটা পছন্দ হত না। যেন প্রীতির অন্তরঙ্গতার মধ্যে কেমন বাধা দিত। বাবা-মার আড়ালে দিদিকে দেখলেই ডাকতেন—'বেলা'। দিদিও সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ করে জবাব দিতেন তারপরেই দু'জনে হেসে ফেলতেন।

সব ছেলে মেয়েদের চেয়ে কবি বেলাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। কিন্তু সেজন্য কোনদিন কোন ভাই-বোন ঈর্ষা বোধ করতেন না। কেন না সকলেই দিদিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন ও মানতেন। বেলা খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। দিদির বুদ্ধি যে তাদের চেয়ে অনেক বেশী তা তাঁরাও মানতেন। বেলা অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই সেইজন্যে বাড়ীর সকলের কাছে প্রচুর আদর পেতেন। সকলের তিনি প্রিয় ছিলেন, বেলার মেধাশক্তিও অত্যন্ত প্রখর ছিল। শিলাইদহে তাঁদের যখন পড়াশুনা আরম্ভ হল, বেলা সকলকে ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে যেতে লাগলেন। কবি তাকে নিজে পৃথক করে পড়াতে আরম্ভ করলেন। তখন থেকেই কবি বুঝতে পেরেছিলেন, বেলার লেখবার বেশ ক্ষমতা আছে, কবি তাকে উৎসাহ দিতেন। তাতে তিনি উৎসাহ পেয়ে কয়েকটী গল্পও লেখেছিলেন।

বেলাকে সকলে ভালবাসত আরও একটি কারণে। বেলা অত্যন্ত স্নেহশীলা ছিলেন। তাঁর এই সরল স্নেহময় স্বভাব সম্বন্ধে ছেলেবেলাকার একটি গল্প কবি লিখেছিলেন :—

"কালকে বেলা বড়ো ব্যথিত হয়ে এসেছিল। ঘটনাটি হচ্ছে, কাল স্বয়ম্প্রভারা ছোট-বাংলাতে মাছের তরকারী রাঁধতে গিয়েছিল। সেখানে একটা পাগল কতকগুলো আম নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল—ছোটোবউ স্বয়ম্প্রভারা ভয় পেয়ে তাকে বিদায় করে দেয়। আমি দোতলার ঘরে চুপচাপ শুয়েছিলুম। বেলা ছোটো-বাংলা থেকে ফিরে এসে আমাকে কাতরভাবে বলতে লাগল—"বাবা একজন ভারী গরীব লোক, বেচারার ক্ষিধে পেয়েছে, তাই আম নিয়ে নীচের বাংলায় বসেছিল—তাকে লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে দিলে", বার বার করে বলতে লাগল, "বেচারা ভারী গরিব, তার কিচ্ছু নেই, এতটুকু একটু কাপড় পরা, বোধহয় শীতকালে কিচ্ছু পরতে পায় না। তার শীত করে, সে তো কিচ্ছু দোষ করে নি। তার নাম জিজ্ঞাসা করলে, সে নাম বললে। বললে, সে স্বর্গে থাকে। তাকে তাড়িয়ে দিলে, সে বেচারা কিচ্ছু

বললে না। অমনি চলে গেল।—আমার এমনি মিষ্টি লাগল। বেলিটার বাস্তবিক ভারী দয়া···বেলিটা বড়ো হলে খুব স্নেহময়ী সরল স্বভাব লক্ষ্মী মেয়ে হবে।"

বেলার বিয়ে হল কবি বিহারীলালের পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে। বিহারে মজঃফরপুরে তিনি তখন ওকালতি করতেন। বিয়ের পর কবি বেলাকে নিজে গিয়ে স্বামীগৃহ মজঃফরপুরে দিয়ে এলেন। শরৎচন্দ্রও খুব ভাল ছেলে ছিলেন। তাঁর স্বভাবে মুগ্ধ হয়ে কবি স্ত্রীকে লিখেছিলেন, "এমন সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জামাই তুমি হাজার খুঁজলেও পেতে না। এমন জামাইয়ের কাছে মেয়ে রেখে এসে কবি নিশ্চিন্ত হলেন। বেলা যে তার স্বামীর সংসারে সুখী হবে তাঁর মনে সংশয় রইল না। কিন্তু তবুও কি পিতার মন মানে? শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে তাঁর কেবল বেলার শৈশবস্মৃতি মনে পড়তে লাগল—"তাকে কত যত্নে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলুম। তখন সে তাকিয়াগুলোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কি রকম দৌরাত্ম করত—সমবয়সী ছোট ছেলে পেলেই কি রকম হুঙ্কার দিয়ে তার উপর গিয়ে পড়ত—কি রকম লোভী অথচ ভালমানুষ ছিল। আমি ওকে নিজে পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে স্নান করিয়ে দিতুম। দার্জিলিঙে রাত্রে উঠে দুধ গরম ক'রে খাওয়াতুম—যে সময় ওর প্রতি প্রথম স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল সেই সব কথা বার বার মনে উদয় হয়।" মজঃফরপুরে বেলার স্বামী শরৎবাবুর প্র্যাকটিস্ ভালোই জমেছিল। কলকাতার হাইকোর্টে এলে আরো উন্নতি করতে পারবে মনে করে কবি তাঁকে ব্যারিষ্টার হবার জন্য বিলাতে পাঠালেন। তাঁর হয়তো মনে ইচ্ছা ছিল বেলা কলকাতায় তাহলে এসে থাকবে, তাকে ঘন ঘন দেখতে পাবেন। কলকাতায় এসে শরৎবাবু প্র্যাকটিস করতে আরম্ভ করলে কবি বেলাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

শরৎবাবুর যখন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ জমে উঠল তখন তাঁরা গিয়ে ডিহি-শ্রীরামপুর রোডে বাসা করলেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর বেলার অসুখ হল। কবি তখন অসুখের খবর শুনে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় এসে রইলেন। তিনি প্রত্যহ বেলার কাছে যান, সারা দুপুর তার সঙ্গে গল্প করেন, নতুন গল্পের প্লট তাকে বলে দেন, লক্ষণ মিলিয়ে হোমিওপ্যাথিক বই দেখে বদলে বদলে ওষুধ দেন। বেলার যক্ষ্মা রোগ হয়েছে, কবির মন তার জন্য সর্বদাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কিন্তু বাড়ি ফিরে কাউকে তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে দেন না। বেলার অসুখ দিন দিন বাড়তে লাগল। কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি কোনো চিকিৎসাতেই কিছু উপকার হল না। কবি বুঝলেন, বেলার যাবার সময় হয়েছে। আজকাল তাই কবির হৃদয় দুর্বল হয়ে আছে, তিনি তার মুখের দিকে তাকাতে পারেন, এমন শক্তি আর তাঁর নেই। শেষ দিন পর্যন্ত রোজ দুপুরে বেলার কাছে তিনি গেছেন। সেদিন ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৬ই মে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ, যখন তিনি ডিহি-শ্রীরামপুরের বাড়ি পৌঁছলেন, তিনি বুঝতে পারলেন যা হবার তা হয়ে গেছে, আদরের মেয়ে আর নেই, গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

কবির মধ্যমা কন্যা রেনুকা (রাণী)

কবির মধ্যমা কন্যা রেণুকার জন্ম হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। যখন তার বয়স আটবৎসর, তখন তারা কলকাতা ছেড়ে শিলাইদহে বাবা মার সঙ্গে বাস করতে থাকে। কবি এখানে এসে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন। দিদি, দাদার সঙ্গে তিনিও লরেন্স সাহেবের কাছে ইংরেজী, জগদানন্দবাবুর কাছে গণিত আর কবির কাছে বাংলা শিখতে লাগলেন। মায়ের কাছে শিখলেন ঘরকন্নার যাবতীয় কাজ। এইভাবে পিতামাতার স্নেহের অন্তরালে তারা ভাই-বোন বড় হতে লাগলেন। রাণীও দেখতে সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু শিশুকাল থেকেই রুগ্ন ও দুর্বল ছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র এগার বৎসর। সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সেই সময় মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। কবির একনিষ্ঠ ভক্ত। একদিন আকস্মিকভাবে কবির কাছে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণীর বিয়ের প্রস্তাব এলো। রাণী রুগ্ন ও দুর্বল ছিলেন বলে কবির মোটেই ইচ্ছে ছিল না অত অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দেন। কিন্তু ছেলেটির আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণীর বিয়ে হল। এদিকে রাণী দিনে দিনে আরো ক্ষীণ হতে লাগলেন। ক্রমশঃ তাঁরও প্রকাশ পেলো যক্ষ্মারোগ। তখনকার দিনে যক্ষ্মারোগের তেমন কোন চিকিৎসাই ছিল না। রোগ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাণীর দেহের উত্তাপও বাড়তে লাগল। জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ তখন বিলাতে, কবি তাঁকে ডাক্তারি পড়বার জন্য পাঠিয়েছিলেন। রাণীর চিকিৎসার ও শুশ্রূষার ভার নিলেন কবি সম্পূর্ণ নিজ হাতে। ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন কাল বিলম্ব না করে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে রাণীকে নিয়ে যেতে। কবি রাণীকে নিয়ে প্রথমে গেলেন হাজারিবাগে। সেখানে রাণীর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেল না। তাঁকে পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া কবি স্থির করলেন। আলমোড়াতে একটি বাড়ি পাওয়া গেল। কিন্তু আলমোড়ায় যাবার পথ দুর্গম। তখন মোটর চলার রাস্তা হয় নি। ঘোড়ায় বা ডাণ্ডিতে কাঠগুদাম থেকে ষাট সত্তর মাইল যেতে হত। অনেক বাধা বিপদ কাটিয়ে কবি রাণীকে নিয়ে আলমোড়ার পাহাড়ে পৌছলেন। রাণীর জন্য একটি মাত্র ডাণ্ডি পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু কবি নিজে কাঠগুদাম থেকে আলমোড়া পর্য্যন্ত রাস্তা বরাবর পায়ে হেটে গিয়েছিল। সে সময়ে কবি-পত্নী বেঁচে ছিলেন না। পরে রাণীকে দেখাশুনার জন্য তাঁদের মামা ও রাজলক্ষ্মী দিদিমাকে আনিয়েছিলেন। সমস্ত অসুখের মধ্যে কবিই তাঁর সেবা করেছিলেন শেষ পর্যন্ত! কত সময় সারারাত পাখার বাতাস করেছেন কিন্তু একটুও ক্লান্তি বোধ করেন নি। তাঁর বাবার হাতে ছাড়া ওষুধ কি পথ্য খেতে ভালো লাগত না। সর্ব্বদা তাঁর বাবাকে কাছে চাই। যদিও তাঁর বিয়ে হয়েছিল তবু তাঁর সমস্ত মন জুড়ে বসে ছিল তাঁর বাবা। আলমোড়াতে কবি যখন রাণীকে নিয়ে এলেন চেঞ্জে, তখন তাঁর অসুখ খুব বেশী। কবি তাঁকে খুশি রাখবার জন্য রোজ রোজ কবিতা লিখে বিছানার পাশে বসে শোনাতেন, যাতে কিছুক্ষণও অন্তত রোগের যন্ত্রণা ভুলে থাকে। এমনি করেই কবির 'শিশু' বইখানা লেখা হয়েছে। অল্পদিন পরেই অসুখ আরো

বাড়ল। কবি সেদিনই তাঁকে পাহাড় থেকে নামিয়ে আনলেন। কি করে আনলেন শুনলে অবাক হতে হয়। যানবাহনের কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না। অথচ রাণীর শরীরের তখন এমন অবস্থা যে একেবারে শুইয়ে না আনলে চলবে না। বহুকষ্টে অনেক বেশী টাকা কবুল করে কতকগুলি কুলিকে রাজি করিয়ে একেবারে খাটশুদ্ধ ধরে আলমোড়া থেকে ষাট সত্তর মাইল পথ কাঠগুদাম ষ্টেশনে নামলেন। কবি আবার হেঁটে এলেন দীর্ঘ পথ। সন্ধ্যাবেলা যখন ষ্টেশনে পৌঁছলেন তার আগেই গাড়ি ছেড়ে গেছে। সারারাত কাঠগুদামে ধরমশালার একটা দোতলা ঘরে কাটিয়ে পরের দিন গাড়ি ধরলেন। সেবারে রাণীকে কলকাতায় আনার কিছুদিন পরে রোগের প্রকোপ আরো বেড়ে গেল। তা দেখে সত্যেন্দ্রনাথকে বিলাত থেকে আসতে তার করা হল। সত্যেন্দ্রনাথ এলেন। ধীরে ধীরে কালের কোলে ঢলে পড়ল রাণী। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্তে রাণী বাবাকে বললেন,—বাবা, 'পিতা নোঽসি' বলো। কবির মন্ত্রটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। তাঁর জীবনের চরম মুহূর্তে কেন তিনি 'পিতা নোঽসি' স্মরণ করলেন, তার অর্থ কবি বুঝতে পারলেন। তাঁর বাবাই যে তাঁর জীবনের সব ছিল, তাই মৃত্যুর হাতে যখন আত্মসমর্পণ করতে হল, তখনো সেই বাবার হাত ধরেই সে দরজাটুকু পার হয়ে যেতে চেয়েছিল। তখনো তাঁর বাবাই একমাত্র ভরসা এবং আশ্রয়। বাবা কাছে আছেন জানলে আর কোনো ভয় নেই। সেইজন্য ভগবানকেও পিতা রূপেই কল্পনা করে তাঁর হাত ধরে অজানা পথের ভয় কাটবার চেষ্টা করেছিলেন। এই সম্বন্ধের চেয়ে আর কোন সম্বন্ধ তাঁর কাছে বেশী সত্য হয়ে ওঠে নি। তাই কবির রাণীর শেষ কথা প্রায়ই মনে পড়ে, স্নেহময় পিতা যেন শুনতে পান তাঁর স্নেহের কন্যার কথা—"বাবা, পিতা নোঽসি বলো।"

কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবী

রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ সন্তান মীরাদেবী। তিনি কবির কনিষ্ঠা কন্যা। তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় মাতৃস্নেহ বেশিদিন তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। যখন তাঁর মাত্র দশ বৎসর বয়স তখন তিনি মাতৃহারা হন। কবি তাঁর মাতৃহারা সন্তানদের পিতা ও মাতা উভয়ের স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে মীরাদেবীর শৈশবকাল কাটে। এই সময় তাঁর খেলার সঙ্গিনী ছিলেন প্রতিমাদেবী। কবির অন্যান্য ছেলেমেয়ের মতো মীরাদেবীও বাড়ীতে থেকেই পড়াশুনা করেন। তিনিও অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মীরাদেবীর যখন ছয় বৎসর বয়স তখন তিনি ভাই-বোনদের সঙ্গে পিতার সহিত কলকাতা থেকে শিলাইদহে আসেন। শিলাইদহে এসে ভাই-বোনদের সঙ্গে মীরাদেবীও লরেন্স সাহেবের কাছে ইংরাজী, কবির কাছে বাংলা ও জগদানন্দবাবুর

নিকট গণিত শিখতে লাগলেন। তারপর তিনি শান্তিনিকেতনে এসে লেখাপড়া করেন। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রী-জীবন কাটে। এই সময় তাঁর শিক্ষক ছিলেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, অজিতকুমার চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ। বিধুশেখর তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। ১৯০৭ সালে প্রায় পনের বৎসর বয়সে কবি তাঁর বিয়ে দিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবি তারপর নগেন্দ্রনাথকে কৃষি বিদ্যা শিখবার জন্য আমেরিকা পাঠালেন। সম্ভবতঃ কবির মনে পল্লী-উন্নয়নের কথাটা বেশী করে মনে হয়েছিল। তাই পুত্র রথীন্দ্র ও জামাতা নগেন্দ্রকে কৃষি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ক'রে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মীরাদেবীর একটি পুত্র ও কন্যা। পুত্রের নাম নীতিন্দ্র ও কন্যার নাম নন্দিতা। নীতিন্দ্রের জন্ম হয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ও নন্দিতার জন্ম হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। একদিকে পুত্র-কন্যা নিয়ে নিজের সংসার, অন্যদিকে বিশ্ববিখ্যাত পিতার পরিচর্যা নিয়ে অবিরত ব্যস্ত থাকতে হয় মীরাদেবীকে। এরই মধ্যে তিনি সাহিত্য চর্চা করেছেন। মীরাদেবী বরাবরই সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। তাঁর অনুরাগ ছিল উদ্ভিদ ও জ্যোতির্বিদ্যায়। পিতার কাছ থেকেই পেয়েছেন তিনি বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। পিতা ছোটবেলা থেকেই তাঁকে বিজ্ঞান পড়াতেন। কবির কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েই তিনি প্রবাসী পত্রিকায় ধর্ম ও বিজ্ঞান নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, "অতসী দেবী" এই ছদ্মনামে তিনি লিখতেন।

শান্তিনিকেতনের প্রতি মীরাদেবীর ছিল সুগভীর মমতা। কবি তা অনুভব ক'রে লিখেছিলেন, "বোলপুরের আকাশ, আলো, মাঠ সেখানকার স্বাধীনতা তোর পক্ষে কতখানি সে তো আমি জানি", দুই কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্রকে হারিয়ে অসহায় কবি কনিষ্ঠা কন্যাকে বেশী ক'রে পেতে চেয়েছিলেন। সে কারণেই উত্তরায়ণের পশ্চিম প্রান্তের মালঞ্চ বাড়িখানি মীরাদেবীর জন্যেই তৈয়ারী করেন রবীন্দ্রনাথ। মীরাদেবী শেষ জীবন পর্যন্ত সেখানেই বাস করেছেন। শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি পিতামাতার অনেক গুণের অধিকারিণী ছিলেন। রান্নাবান্না, ঘরকন্নার কাজ তিনি মায়ের কাছ থেকে শিখেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি মায়ের যথার্থ কন্যা ছিলেন। মৃণালিনী দেবীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন রন্ধন-পটুতার গুণ। কবির অসুখের সময় তাঁর জন্য রান্না করতে কেউ সাহস পেতেন না। মীরাদেবীই বাবার জন্য রন্ধন করে দিতেন নিজ হাতে। কবি নিজেও বলে গেছেন "মীরু তো খুব ভাল রান্না করে", কবি সুস্থ অবস্থায়ও মীরাদেবীর রান্না খেতে খুব ভালবাসতেন। মায়ের মতো তিনি লোকজনকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। পাঠভবনের শিশু-বিভাগের ছেলেরা ফুটবল ম্যাচ খেলে যেতো মালঞ্চে মীরাদির কাছে নিমন্ত্রণ খেতে।

মীরাদেবী বাবার কাছ থেকেও অনেক গুণের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি পিতার অসাধারণ ধৈর্য ও সহনশীলতাগুণ লাভ করেছিলেন। পুত্র নিতু জার্মানীতে ছাপার কাজ শিখতে যান। ১৯৩২ সালে সেখানে তাঁর মৃত্যু হল। কবি নিতুকে খুব ভালবাসতেন। একমাত্র দৌহিত্রের মৃত্যুকে কবি

নিজে যেমন অসাধারণ ধৈর্য সহকারে গ্রহণ করলেন, তার চেয়েও অধিক ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করলেন মীরাদেবী একমাত্র পুত্রের মৃত্যু। কিছুদিন ধরেই জার্মানীতে নিতুর অসুখ, মীরাদেবী অসুখ শুনে জার্মানীতে গেলেন। ছেলে বাঁচলো না। কিন্তু অসীম ধৈর্যের প্রতিমূর্তি মীরাদেবী ভেঙ্গে পড়লেন না। বিধাতার এই নির্মম দানকে অপরিসীম সহনশীল শক্তি দিয়ে গ্রহণ করে নিলেন। কবির 'শেষ মস্তক' ও 'পুনশ্চ' বইখানা নিতুর অসুখ ও মৃত্যুর গভীর বেদনা নিয়ে লেখা। শোকাতুরা কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে কবি সেদিন লিখেছিলেন, "যতবার যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েছে, সে চলেচে অবিচলিত মনে তার যাত্রার সঙ্গে আমর যাত্রা মেলাতে হবে। লজ্জা হয়, যদি আমার শোক নিয়ে একটুও সরে পড়ি, সকলের সংসার থেকে লেশমাত্র ভার চাপাই নিজের অচল বেদনা দিয়ে বিশ্ব সংসারের সচল চাকার উপরে। নিতুকে খুব ভালবাসতুম, তাছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে।…কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক। যেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালবাসা হয়তো বা পৌঁছয়—নইলে ভালবাসা এখনো টিঁকে থাকে কেন? "পিতার সেই সান্ত্বনাবাণীই হয়তো শেষজীবনে পচাত্তর বছর বয়সে ও একমাত্র কন্যা নন্দিতাকে হারানোর নিদারুণ শোক সহ্য করবার শক্তি দিয়েছিল। নন্দিতার বিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনির সঙ্গে, কৃপালনি সাহিত্য একাদমি সচিব এখন। গত ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নন্দিতার মৃত্যু হয়। স্বামী নগেন্দ্রনাথেরও মৃত্যু হয়, তারও অনেক আগে।

সুখে দুঃখে পরম আত্মীয়ের মত তিনি ছিলেন সকলের। প্রতিদিনের সকলের সঙ্গে তাঁর মিষ্ট ব্যবহারের তুলনা হয় না। তাঁর স্নেহভরা মন স্নিগ্ধ করেছে, আনন্দিত করেছে সকলকে।

বাবাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। বিয়ে হলেও বাবাকে ছেড়ে বেশী দিন থাকেন নাই। সময় পেলেই বাবার কাছে চলে আসতেন। বাবার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর অন্তিম শয্যাপার্শ্বে বসে অক্লান্তভাবে সেবা করেছেন। মীরাদেবী খুবই শান্তপ্রকৃতির ও স্বল্পভাষী ছিলেন। কম কথা বলা তাঁর অভ্যাস ছিল। সামনে বসে বেশীক্ষণ গল্প-স্বল্প করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। কবি তাঁর স্বভাব জানতেন। তাই অসুখের সময় তাঁকে ঘরে বেশীক্ষণ দেখতে না পেলে বিস্মিত হতেন না। মীরাদেবী ধীর, স্থির, শান্ত ও ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। পুত্র, পিতা, স্বামী, কন্যা সকলের মৃত্যুকে শান্তভাবে গ্রহণ করেন।

তিনি ভাই বোন সকলের ছিলেন পরম স্নেহের, কবির আদরের মেয়ে স্বামীর লক্ষ্মী স্ত্রী পুত্র-কন্যার স্নেহশীলা মাতা, ভ্রাতৃবধূর স্নেহের ঠাকুরঝি। তাই শান্তিনিকেতনে শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা বৌঠানের মৃত্যু-সংবাদ শুনে শোকাভিভূতা হ'য়ে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে বৌঠানকে শেষবারের মতো দেখতে

এলেন। কলকাতায় তখন তিনি খুবই অসুস্থা, শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। চিকিৎসকের নির্দেশে তাঁর নড়াচড়া করা বন্ধ ছিল। তবুও বৌঠানের মর্মান্তিক মৃত্যু খবর পেয়ে তিনি কারো নিষেধ শুনলেন না, বললেন—"বৌঠানকে আমি দেখতে যাবই।"

তিনিও আজ নেই। ১৫ই মার্চ (১৯৬৯) শনিবার, ভোর সাড়ে চারটার সময় কলকাতায় তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন, সমীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ পুত্র, তো শৈশবেই মারা যান, কন্যা মাধুরীলতা ও রেণুকাও নিঃসন্তান ছিলেন। মীরাদেবীর পুত্র অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান, ও কন্যারও কোন সন্তান হয় নাই। তাই মীরাদেবীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র বংশ ধারা লুপ্ত হয়ে গেল। যার সবাই যায় তারও কেউ-না-কেউ থাকে। মীরাদেবীর কেউ ছিল না; না জ্যেষ্ঠ; না কনিষ্ঠ, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, একমাত্র পুত্র, একমাত্র কন্যা, স্বামী বৌঠান কেহ তাঁর মৃত্যুর সময় জীবিত ছিল না। সর্বরিক্ত শীতের মত নিস্পলক এক নিষ্পত্র নারীত্বরূপে তিনিই দাঁড়িয়েছিলেন। সকল মুকুল ঝরে গেল, তিনিও গেলেন। বেলা শেষে সবার শেষে শেষ খেয়ায় তিনি গেলেন। তাঁরা নাই কিন্তু পৃথিবীর বুকে রয়ে গেছে তাঁদের স্মৃতি।

ইয়াসিন

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

আমরা তখন ছোট মহকুমা শহর উলুবেড়িয়াতে।

চাকর আর পাওয়া যায় না।

যদিও পাওয়া যায়, দশ পনের দিনের বেশী টেঁকে না। সবাই যখন বাড়ির চাকর সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ছে এমন সময় আমাদের বাড়িতে হঠাৎ একদিন গণেশ এসে হাজির, লোকটাকে দেখলে তার সঠিক বয়সটা অনুমান করা কষ্ট। ত্রিশও হতে পারে পঁয়তাল্লিশও হতে পারে।

রোগা ডিগডিগে চেহারা। কালো কুচকুচে গায়ের বর্ণ।

মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে ঝলঝলে একটা খাকী ছেঁড়া ময়লা প্যান্ট, গায়ের অনুরূপ একটা খাকী কোট।

খালি পা।

ঠিক যেন ক্ষেতের মধ্যে দেখা কাকতাড়ুয়া—মাথার উপরে একটা কালো হাঁড়ি বসিয়ে দিলেই হয়।

ওকে দেখে বাড়ির সবাই ত হেসেই খুন।

আমাদের হাসি দেখে ও মিঠি মিঠি হাসে—এক ঝাঁক মুলোর মত সাদা সাদা দাঁত বের করে।

মা তাকে নাম জিজ্ঞাসা করেন, কি নাম রে তোর।

আজ্ঞে শ্রীকার্তিক সামন্ত।

কার্তিকই বটে—আবার সঙ্গে শ্রী।

আর এক দফা সকলের হাসি। কার্তিকও হাসে।

বোকার মত হাসচিস কেন? দিদি বলে।

আজ্ঞে আমি অমনি হাসি। কার্তিক বলে, হাসিটা ঠাকুমা বলতো আমার একটা ব্যারাম।

কাজকর্ম কিছু পারিস?

আজ্ঞে, মুখে আবার সে কথা কি বলবো—কাজ দিয়ে দেখুন—

চারদিন ধরে কোন চাকর নেই বাড়িতে অতএব কার্তিককে রাখা হলো। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা যেন চারহাতে কাজ করে।

কাজ দেখে সবাই খুশি! বিশেষ করে মা ত খুবই খুশি।

কার্তিক থেকে গেল।

বাবা আবগারী বিভাগের দারোগা—এবং অত্যন্ত সৎপ্রকৃতির একজন অফিসার বলে তাঁর যথেষ্ট সুনাম।

গণেশ আমাদের গৃহে আসবার মাসখানেক আগে বাবা একটা বিরাট কোকেন কেস ধরেছেন।

বহু টাকার চোরাই কোকেন।

একজন ইন্‌ফরমারের কাছ থেকে বাবা আগেই সংবাদটা পেয়েছিলেন—হংকং থেকে আগত একটা মালবাহী জাহাজ থেকে ঐখানে নাকি কোকেন ফেলে দেবে।

বাবা সংবাদটা পেয়ে ওৎ পেতে ছিলেন একটা জেলে ডিঙ্গি নিয়ে গঙ্গার মধ্যে। জাহাজটা যেতে যেতে কোকেনের প্যাকেটগুলো ফেলে দিতেই চোরাই কারবারীরা সে প্যাকেটগুলো জল থেকে উঠাবার আগেই বাবা তার দলবল নিয়ে গিয়ে তাদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়া পড়লেন। সবাই পালাল কিন্তু একদল ধরা পড়লো। নিম্নশ্রেণীর কয়েকটি মাঝি। তারা পুলিশ দেখে চট্‌পট পালিয়ে গেল একজন বাদে। বাবা তার লোকদের সাহায্যে প্যাকেটগুলো করায়ত্ব করে ডাঙ্গায় এসে উঠলেন। বহু টাকার চোরাই কোকেন।

ছোট মহকুমা শহরে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল!

পুলিশ এলো, মামলার কাগজ-পত্র তৈরী হতে লাগল।

মামলা তখনো আদালতে ওঠে নি, এমন সময় একদিন একজন লোক মারফৎ বাবার কাছে সংবাদ এলো—দশ হাজার টাকা তারা বাবাকে দিতে রাজী আছে বাবা যদি তাদের পরামর্শ মতো মামলাটাকে সাজাতে রাজী থাকেন।

বলা বাহুল্য বাবা সরাসরি তাদের প্রত্যাখ্যান করলেন।

আবার এলো দু'দিন বাদে অন্য লোক—টাকার অঙ্ক আরো বেশী।

বাবা বললেন, না।

টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে বাড়িয়ে তারা পঞ্চাশ হাজারে উঠলো কিন্তু বাবা অচল-অটল।

ওরা বুঝলে সুবিধা হবে না।

সেই সময়ই কার্তিক এসে চাকরিতে ঢোকে আমাদের বাড়িতে।

মোকদ্দমার তোড়জোড় চলচে—

রীতিমত চাঞ্চল্য জাগালো মোকদ্দমা। যে লোকটা ধরা পড়েছিল সে এপ্রুভার—রাজ-সাক্ষী হয়েছে—আরো চার পাঁচজন দলের ধরা পড়েছে ইতিমধ্যে।

আমাদের এক ছোট বোন ছিল বছর পাঁচেকের—এক মাসের মধ্যেই কার্তিকের সে রীতিমত ন্যাওটা হয়ে পড়েছিল।

সর্বক্ষণ সে কার্তিকের কাঁধে চড়ে বেড়াতো।

কার্তিক তাকে কাঁধে নিয়েই সর্বক্ষণ কাজ করত।

মামলা ওঠার তখন আর মাত্র দিন সাতেক আছে, এমন সময় একরাত্রে আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়লো।

বাবা সেদিন সন্ধ্যার ঠিক পরেই হঠাৎ একটা গোপন সংবাদ পেয়ে একটা দেশী চোলাই মদের আড্ডায় হানা দেবার জন্য বেরিয়ে গিয়েছেন।

বাড়িতে পুরুষের মধ্যে একমাত্র কার্তিক—আর আমরা দু'ভাই। একজনের ত তখন বছর চৌদ্দ বয়স আর ছোট ভাইয়ের, বার।

আমাদের বাড়িটা ছিল একেবারে শহরে এক প্রান্তে গঙ্গার ধার ঘেঁষে। আশেপাশে এমন একটা বাড়ি নেই যে সেখানকার লোকেরা আমাদের চিৎকার শুনে ছুটে আসবে। হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে আলো আর অতগুলো সশস্ত্র লোক দেখে ত আমরা তখন হাউমাউ করে সকলে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছি।

ডাকাতের দল বাড়ির সব ঘর প্রায় তচনচ করে যখন শোবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—কার্তিক তাদের বাধা দিল।

বললে, না—আর এক পাও না আবদুল্লা সাহেব।

লম্বা চওড়া যে লোকটাকে সম্বোধন করল কার্তিক বুঝলাম তারই নাম আবদুল্লা। তার হাতে একটা ছোট্ট পিস্তল।

থমকে দাঁড়াল যেন আবদুল্লা সাহেব; তারপরই হঠাৎ কার্তিককে সম্বোধন করে বললে, ইয়াসিন—রাস্তা ছাড়—

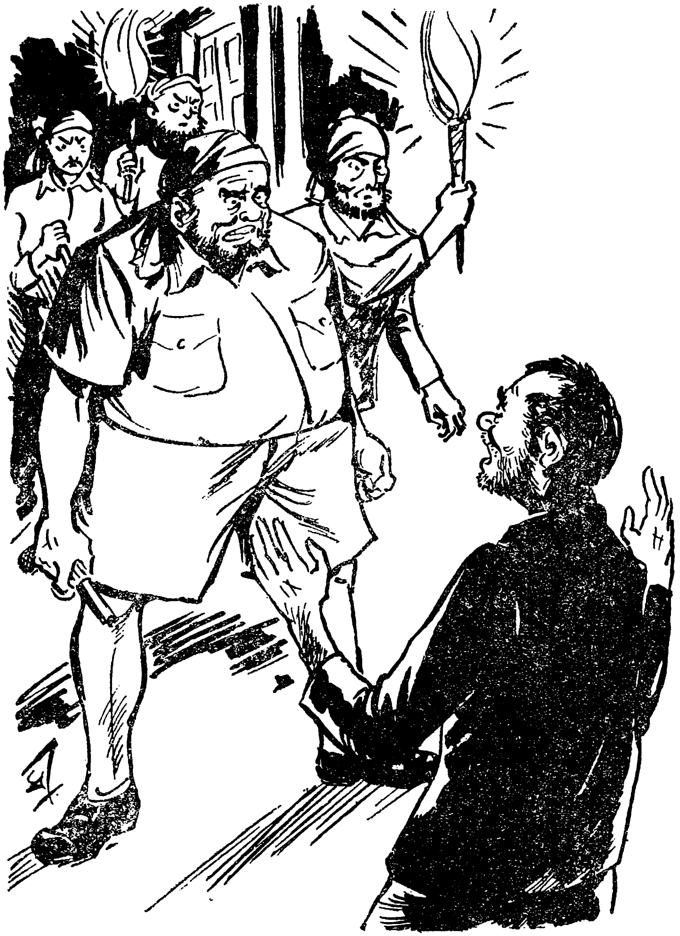

ইয়াসিন—রাস্তা ছাড়লো না—

আমরা ত অবাক। কার্তিককে ও ইয়াসিন বলে সম্বোধন করলে কেন! কার্তিকের নাম কি ইয়াসিন—আর ওকে কি ও চেনে?

ইয়াসিন, এখনো ভাল চাস ত রাস্তা ছাড়—

না আবদুল্লা সাহেব, দারোগাবাবু বাসায় নাই আমার উপরেই সব জিম্মা যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি তোমাদের ঘরে ঢুকতে দেবো না।

ইয়াসিন!…

ফিরে যাও আজ সাহেব—

অন্য একজন বললে, ও সালা দলের সঙ্গে নিমকহারামী করছে আবদুল্লা—ওকে শেষ করে দাও!

সর্বনাশ! বুকের মধ্যে তখন আমার কাপুনী শুরু হয়েছে—ইয়াসিন ঐ হাবাগবা লোকটা তাহলে ওদেরই দলের একজন!

বলেছি ত আবদুল্লা সাহেব—আজ তোমাদের ফিরে যেতে হবে—ইয়াসিন আবার শান্ত গলায় বলে।

ইয়াসিন—আবদুল্লাকে কি তুই চিনিস না ?

তুমিও কি চেনো না ইয়াসিনকে ? ঘরে আজ তোমাদের ঢোকা হবে না।

ঢুকবো—দারোগার বৌ, ছেলে-মেয়ে সবাইকে আজ খুন করে রেখে যাবো—আবদুল্লা আবার বলে।

না।

হঠাৎ আবদুল্লার হাতের পিস্তল গর্জে উঠল।

গুলি তার বুকে লেগেছিল—রক্তাক্ত আহত সে দরজার উপর লুটিয়ে পড়লো একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা-কাতর শব্দ করে।

ইয়া আল্লা!

ইয়াসিন তখনো মরে নি—আবদুল্লা আবার পিস্তল উঠাতে যাবে দলের একজন ছুটে এসে বললো, সাহেব পালাও শিগ্‌গ্রী—দারোগা সাহেব আসছে সঙ্গে পুলিশ।

চোখের পলকে সব কোথায় সরে পড়ল।

ইয়াসিন তখনো মৃত্যুর সঙ্গে জুঝচে।

বাবা এসে পড়লেন—

ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ইয়াসিনের মৃত্যু হলো।

জড়িত কণ্ঠে সে তার শেষ জীবন-বন্দী দিয়ে গেল—আবদুল্লারই দলের লোক সে—আমাদের খতম করতেই চাকর সেজে সে আমাদের বাড়িতে এসে চাকরি নিয়েছিল—

কিন্তু বেচারী আমার ছোট বোনটিকে ভালবেসে নিজের কাজ করতে পারে নি মায়ায়। নিশ্চেষ্টতা দেখেই আবদুল্লা স্বয়ং দলবল নিয়ে এসে আমাদের বাড়িতে হানা দেয়।

তারপর কত বছর চলে গিয়েছে—

প্রৌঢ় আজ আমি—

দেশ ভাগ হয়ে হিন্দুস্থান-পাকিস্থান হয়েছে—কিন্তু ইয়াসিনকে আজো ভুলতে পারি নি।

সে সেদিন না থাকলে আজ এ কাহিনী শোনাবার অবকাশ পেতাম না কাউকে। মুসলমান ইয়াসিন সেদিন যেভাবে আমাদের হিন্দু পরিবারটিকে নিজের প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়েছিল, সে কথা যখনই ভাবি মনে হয়—সকল মানুষই সকল জাতের প্রণম্য।

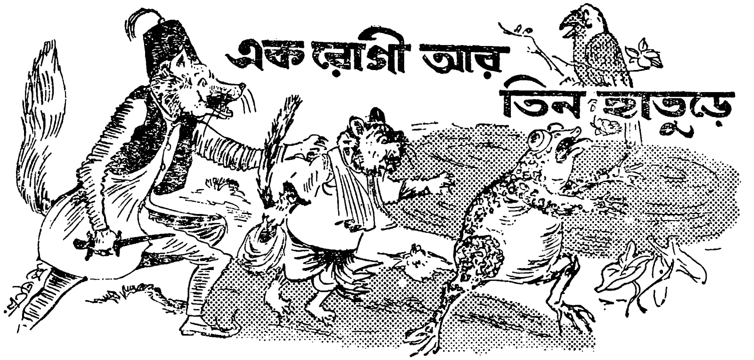

এক রোগী আর তিন হাতুড়ে

শ্রীসুবীর চট্টোপাধ্যায়

(একাঙ্ক নাটক)

হাসি—পাতিহাঁসের দুষ্টু ছানা
ব্যাঙ-বাহাদুর—কচুবনের কোলা ব্যাঙ
হুক্কা-হাকিম— বৃন্দাবনে হাকিম শেয়াল
বদ্যি-বেড়াল— বদ্যিবাটির বেড়াল বদ্যি
কাক-কোবরেজ—ওতোরপাড়ার কোবরেজ কাক
চিড়িক—কচুবনের ইঁদুর
স্থান—অচিন বনের জলার ধার
কাল—সন্ধ্যাবেলা, অন্ধকার।

হাসি— অন্ধকারে জলার ধারে
পঁ্যাক পঁ্যাক পঁ্যাক পা,
গান ধরেছি খোশমেজাজে
আমি হাঁসের ছা।
ঝুমুর পরে নেচে বেড়াই
আনন্দেতে টিটকিরি গাই
আছি সুখে হাসিমুখে
তাইরে নাইরে না॥
ঘুরি ফিরি বনবাদাড়ে
গুগ্‌লি তুলে খাই।
ইচ্ছে হ'লে খড়ের গাদায়
সুখেতে গান গাই।
কে আছো গো আজকে রাতে
গলা মেলাও আমার সাথে,
জেগে উঠে শুনুক সবাই
খুশির গানখানা॥

ব্যাঙ-বাহাদুর—গ্যাঙোর গ্যাঙোর গে
রাতদুপুরে কাণের কাছে
চেঁচাস রে তুই কে?
দেখবি মজা উঠলে পরে
মারব আছাড় জাপটে ধরে
'বাপ্‌রে' বলে পালিয়ে যাবার
পথটা পাবিনে॥

হাসি— পঁ্যাক পঁ্যাক পঁ্যাক পা,
কথা শুনেই পাচ্ছে হাসি
হাহা, হাহা, হা।
সাহস থাকে আয় না তবে
গায়ের জোরের লড়াই হবে
তোকে আবার ডরাই নাকি
আমি হাঁসের ছা॥

ব্যাঙ-বাহাদুর—গ্যাঙোর গ্যাঙোর গান
বটে বটে এমন কথা
বিদঘুটে শয়তান!

এক খাবলে খপাং করে
খাবলে নোব কাণ।
রাগিয়ে দিলি যখন আমায়
বাঁচবে না তোর জান,
রেডি রেডি এক দুই তিন
গ্যাঙোর গ্যাঙার গান॥

হাসি— প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক
ভয় ডর জানি না,
লেগে গেল মারামারি
আনি বানি মানি না।
প্যাঁচ কষে দেব ল্যাং
ভেঙ্গে যাবে তোর ঠ্যাং
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত,
জাপানী কায়দা দেখ, ব্যাঙ কুপোকাত,
একখানা ল্যাঙেতেই হল বাজিমাৎ॥

ব্যাঙ-বাহাদুর—উঁহু উঁহু, গেছি গেছি
গ্যাঙোর গ্যাঙোর গ্যাঙ
জাপানী প্যাঁচ লাগিয়ে দিয়ে
হাঁস মেরেছে ল্যাঙ!
ওরে বাবা একি হল
মুচ্‌কে গেছে ঠ্যাং।
কে আছো গো দৌড়ে এস
গ্যাঙোর গ্যাঙোর গ্যাঙ॥

হাসি— বেশ হয়েছে বেশ হয়েছে
ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং
এবার আমি চলি ভায়া,
টা-টা বাই-বাই,
ঠ্যাং এর জ্বালায় চেঁচাও তুমি
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক পাই॥
(হাসির প্রস্থান)

চিড়িক— চকর চকর চল
কি হয়েছে ব্যাঙ বাহাদুর
আমায় খুলে বল,

ব্যাঙ-বাহাদুর—গ্যাঙোর গ্যাঙোর গ্যাঙ
মারল হাসি ল্যাং
মুচকে গেছে ঠ্যাং
বাপরে মারে গেলাম মরে,
বাঁচাও বাঁচাও ভাই,
বদ্যিবাড়ি হেঁটে যাবার
শক্তি আমার নাই॥

চিড়িক চিড়িক, চিড়িক, চকর চকর
চিক চিক চিক চিক,
বদ্যি, হাকিম আর কোবরেজ
আনবো ডেকে ঠিক॥
বদ্যি বাটির বদ্যি বেড়াল
দেশজোড়া তাঁর নাম,
হুক্কা হাকিম থাকেন আবার
শ্রীবৃন্দাবন ধাম।
কাক কোবরেজ ওতোরপাড়ায়
ব্যাবসা করেন জোর,
তিন হাতুড়ের কাছে গিয়ে
বলছি কথা তোর॥

ব্যাঙ-বাহাদুর— গ্যাঙোর গ্যাঙোর গা
লক্ষ্মী সোনা চিড়িক ভায়া
পা চালিয়ে যা॥

চিড়িক— চিড়িক চিড়িক চা
যাবো যাবো অমন করে
চমকে দিও না॥

ব্যাঙ-বাহাদুর—গ্যাঙোর গ্যাঙোর গা
আর যে বাঁচি না,

ওগো ঠাকুর এই যাত্রায়
বাঁচাও আমার প্রাণ
কালিঘাটে পাঁচ শো গেড়ি
করব বলিদান ॥
ওরে চিড়িক দাঁড়িয়ে কেন
কথা শুনিস না ?
তাড়া করে যারে যাদু
গ্যাঙোর গ্যাঙোর গা ॥

[চিড়িকের প্রস্থান।

কিছুক্ষণ পর তিন হাতুড়ের প্রবেশ]

হুক্কা-হাকিম—হুক্কা হুয়া হুক
কেয়া হুয়া পা ভেঙেছে
আহারে চুক চুক ॥
জিভ দেখবো করতো হাঁ
খোশ মেজাজে খেয়াল গা ॥

ব্যাঙ-বাহাদুর—গ্যাঙোর গ্যাঙোর ওগো হাকিম
মর'ছ যে ব্যাথায়।
এখন দাদু কেমন ক'রে
খেয়াল গাওয়া যায় ॥

হুক্কা-হাকিম—হুক্কা হুয়া হুম্
দেখি তো তোর পেট বাজিয়ে
হুহুম্ হুহুম্ হুম্ ॥

ব্যাঙ-বাহাদুর—গ্যাঙোর গ্যাঙার গাই
মরে গেলাম ভাই।
হাকিম মামা পেটটা ছাড়ুন
পাচ্ছে হাসি, হা।
কি মুশকিল, একি জ্বালা
গ্যাঙোর গ্যাঙোর গা ॥

হুক্কা-হাকিম—হুক্কা হুয়া হয়
রোগটা সহজ নয়,
ইংরেজী নাম দারুণ জটিল
তাইতো আমার ভয় !

বস্তি-বেড়াল—মেঁয়াও মেঁয়াও মে
বিদ্যে তোমার জানাই আছে
থামো বাপু হে ॥
এতবড় ব্যাপারে তে
ডাকল তোমায় কে ?
শোন শোন ব্যাঙ বাবাজি
কাপছ কেন একি !
কি হয়েছে ব্যাপার খানা
আমায় বল দেখি ॥

ব্যাঙ-বাহাদুর—গ্যাঙোর গ্যাঙোর গ্যাঙ
হাসি দিল ল্যাং
মুচকে গেছে ঠ্যাং

বস্তি-বেড়াল— মিঁয়াউ, মিঁয়াউ, মেয়াও, মেয়াও
মিয়াউ মিয়াউ, ময়।
পূবদিকেতে মুণ্ডু করে
ডিকবাজি খাও ছয়।
একটা ঠ্যাঙে দাড়িয়ে থেকে
ডন বৈঠক দাও
কোনা কুনি একুশ বিঘে
পিছু হেঁটে যাও ॥

হুক্কা-হাকিম—আই বস্তি চোপরও তোম
হুক্কা হুয়া হা
শোন, শোন ব্যাঙ বাবাজি
বলছি আমি যা,
বাজে কথায় কাজের সময়
নষ্ট কোর না।
তোমার দারুণ জ্বর হয়েছে
বাঁচতে যদি চাও
চুপটি করে ঘাসের উপর
সটান শুয়ে যাও ॥

ব্যাঙ-বাহাদুর—গ্যাঙোর গ্যাঙোর শোব কেন
ব্যাপার কেমন ধারা ?
অলুক্ষণে হাকিম এটা
গেলাম বুঝি মারা ॥

হুক্কা-হাকিম— হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া
হুক্কা হুয়া হাই;
ছুরি দিয়ে পেটটা তোমার
কাটতে হবে ভাই;
মাথাখানা ফুটো করে
ঢালতে হবে পাঁক,
গলায় তোমার বাঁধব দড়ি
বন্ধ কর ডাক॥

বস্তি-বেড়াল—মেয়াও মেয়াও মোটেও তা নয়
মেয়াও মেয়াও মা
ওহে বাপু হুক্কা-হাকিম
কিচ্ছু জানো না॥
হয়েছে তোমার ফটফটে জ্বর
ওষুধ হ'ল তার
মাথার ওপর তুলে নিয়ে
একশোটা আছাড়॥

কাক-কোবরেজ—কাকা কাকা কাক্
থামো থামো দুই হাতুড়ে
খুব হয়েছে থাক্।
জ্ঞান-গম্যির বহর দেখে
মুচ্ছা বুঝি যাই,
ব্যাঙ বাবাজি এই দিকেতে
এসো তুমি ভাই,
বলো দেখি কি হয়েছে
দাওয়াইটা বাৎলাই॥

ব্যাঙ-বাহাদুর—গ্যাঙোর গ্যাঙোর গ্যাঙ
মারল হাসি ল্যাঙ
মুচকে গেছে ঠ্যাঙ

কাক-কোবরেজ—কাকা কাকা কি
গুরুতর ব্যাপার এটা
আগেই বুঝেছি!
অমাবস্যা প্রতিপদ—
নাকি দ্বিতীয়ায়
ব্যাথাখানা বাড়ে কখন
বল ত আমায়?
কুমড়ো খেলে বাড়ে,
নাকি হিঞ্চে খেলে বাড়ে?
জ্বলে কখন দিনে
নাকি রাতের অন্ধকারে?
কান্না-হাসি উত্তেজনা
কিংবা শিহরণ!
তোমার বুকের ধড়ফড়ানি
কমে গো কখন?

ব্যাঙ-বাহাদুর—গ্যাঙোর গ্যাঙোর-গে
এই মরেচে কি জ্বালাতন
এটা আবার কে?

কাক-কোবরেজ—কাকা, কাকা, কা
দেখি নাড়িটা।
হুঁ-হুঁ দারুণ ব্যাপার
গোলমেলে বড়ই
তোমার আয়ু হয়ে এসেছে,
সত্যি কথা কই॥
দারুণ জোরে নাড়িখানা
করতেছে দপ্‌দপ্‌
একই সাথে কুপিত যে
পিত্ত, বায়ু, কফ॥
বাতরক্ত রক্তপিত্ত
সান্নিপাত আর
শিরোঘূর্ণণ বিবমিষা
স্নায়ুর বিকার॥

ব্যাঙ-বাহাদুর—গ্যাঙোর গ্যাঙোর গায়
কি সব্বোনাশ এইবারেতে
প্রাণটা বুঝি যায়!
হেই কোবরেজ বাঁচাও আমায়
দোব যা চাও তা,
গেছি গেছি ওরে বাবা
গ্যাঙোর গ্যাঙের গা॥

কাক-কোবরেজ—একদম চুপচাপ কাকা কাকা কা
শাস্ত্রে যা লেখা আছে শোন বলি তা॥

বাতাবি লেবুর রসে ভিজিয়ে বেগুন
ছাগলের দুধে দিয়ে সন্ধব নুন ॥
পচা পুকুরের পাঁক, একসের পানা
হাঁড়িচাচা কাদাখোঁচা কাকেদের ডানা ॥
অট্টালিকা চূর্ণ আর মৃত্তিকা গ্রামের
তার সাথে একাঙ্গী দাও এক সের ॥
কৃষ্ণচতুর্মুখ, ব্রাহ্মী রসায়ণ
জটামাংসীর মূল, অষ্টাঙ্গ লবন ॥
এইবার বেশ করে পাক করে নাও
কুয়াশায় শিশিরেতে মাঠে রেখে দাও ॥
তারপর সাদা খলে মধু দিয়ে মেড়ে
চেটে খেলে এই রোগ যাবে ঠিক সেরে ॥

ব্যাঙ-বাহাদুর—গ্যাঙোর গ্যাঙোর গ্যাঙোর গ্যাঙোর
গ্যাঙোর গ্যাঙোর গাঁক,
খুব হয়েছে ওরে বাবা
চিকিচ্ছে মোর থাক ॥
তিনটে ডাকাত গুণ্ডা খুনে
বাঁচতে যদি চাই,
এক লাফেতে এখান থেকে
পুলিশ পাড়া যাই ॥

কাক-কোবরেজ—কাকা, কাকা, কর
আরে আরে পালিয়ে গেল
ধররে চেপে ধর।
কষ্ট করে করছি দাওয়াই
খাইয়ে যাব যে,
কে আছো গো ধর ওকে
কাকা, কাকা, কে ॥

বস্তি-বেড়াল—মেয়াও মেয়াও মান
দুষ্টু রোগী পালিয়ে গেল
আনরে ধরে আন ॥
মাথায় তুলে আছাড় দিয়ে
সারাব নির্ঘাৎ,
রোগী হঠাৎ ছুট লাগাল
ম্যাও ম্যাও ম্যাও মাৎ ॥

হুক্কা-হাকিম—হুক্কা হুয়া হৈ
আরে আরে একি ব্যাপার
রোগী গেল কৈ ?
অপারেশন করব বলে
করছি ছুরি ঠিক
এমন সময় রোগী আমার
পালাল কোন্‌দিক ?
ইঁদুর ছুঁচো কোথায় আছিস
দৌড়ে তোরা আয় ॥
খোড়া পায়ে রোগী আমার
ঐ পালিয়ে যায় ॥

ব্যাঙ-বাহাদুর—গ্যাঙোর গ্যাঙোর গাপ
বাপরে বাপরে বাপ্‌
এই মেরেছি লাফ ;
তিন হাতুড়ের হাতে পড়ে
হলাম নাজেহাল
তিনটে খুনী কি সাংঘাতিক
ছাড়িয়ে নিতো ছাল।
আজকে আমার প্রাণটা যেতো
সারতে গিয়ে ঠ্যাং
দারুণ বাঁচা বেঁচে গেছি
গ্যাঙোর গ্যাঙোর গ্যাঙ ॥ *

---

* বিঃ দ্রঃ—আকাশবাণী কলকাতা থেকে শিশু-মহলে প্রচারিত।

গ্রীষ্মের ছড়া

শ্রীমনীষ বসু

সূর্য আগুন ঢালে—
এ কথাটা ভুল কি ?
নরহরি হাঁকে : 'আন
সরবৎ—কুল্‌পি !'
সারা গায়ে নুন ঢেলে
ঘাম-নদী বইছে—
জ্বালাতন—জ্বালাতন,
অতিষ্ঠ হই যে।
চিট্‌-মিট্‌ করে ওঠে
লক্ষটা ঘামাচি—
ঘামাচির তাণ্ডবে
আর বুঝি না বাঁচি !
সাধ হয়, ডুব দিই
সমুদ্র-বক্ষে—
হে ঠাকুর, বারি দাও
পাই যেন রক্ষে !!

ঢোল বলে

শ্রীপ্রীতিভূষণ চাকী

কুরপাক,
ঘুরপাক,
চুপ থাক।

ঢাক বলে—
মোর নাই রাখ্‌ঢাক।
ঢোল বলে—
একদম চুপ থাক।

কুরপাক্‌,
ঘুরপাক্‌,
চুপ থাক্‌।

মজার ম্যাজিক

বিলেত যাবার পথে
এডেন বন্দরে

যাদুকর ঃ এ. সি. সরকার

সেবার বিলাত যাচ্ছিলাম জাহাজে করে। বোম্বাই বন্দর থেকে ছেড়ে জাহাজ গিয়ে থামলো করাচী বন্দরে। সেখানে কয়েক ঘণ্টা থামার পরে জাহাজ আবার নোঙর তুললো। এবার শুরু হল আরব-সাগর পাড়ি দেবার পালা। কোনদিকে কূল-কিনারা নেই—চারদিকে শুধু ঢেউ আর ঢেউ, জল আর জল, নীল জল আর নীল আকাশের জটলা। এই পথটুকুন সত্যিই খুব একঘেয়ে লাগছিল। এর পরে যখন এক সকালে গিয়ে জাহাজ এডেন বন্দরে ভিড়লো তখন তাই কূলভাঙা খুশিতে মেতে উঠলো সবাই। চারদিকে পড়ে গেল সাজ সাজ রব। বন্দরে নামার জন্য মহাব্যস্ত হ'য়ে উঠলো সবাই।

সঙ্গীদের সঙ্গে আমিও নামলাম বন্দরে। জাহাজঘাট ছেড়ে অল্প দূরে গেলেই বন্দরের বাজার এলাকা। নানারকমের মনোহারী জিনিষের দোকান—রকম রকম নানাধরনের বিদেশী জিনিষ থরে থরে সাজানো। ঘড়ি, জামা, ক্যামেরা কম্বল। কি ছেড়ে কি কিনবে লোকে, তাই নিয়ে পড়লো কাড়াকাড়ি। সব কিছুই যে ভয়ানক সস্তা এখানে। আমি আর কি কিনবো। একটা পার্কার কলম নিলাম এক ভারতীয় ভদ্রলোকের দোকান থেকে। ক্যাশ-মেমোতে নাম লেখার জন্য আমার নাম জানতে চাইলেন দোকানী। নাম বললেই চোখের চশমাটা কপালে তুলে রেখে বিস্ফারিত দু'চোখ তুলে তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। তারপর গদগদ কণ্ঠে বললেন,—"কি সৌভাগ্য আমার, বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় যাদুকর যাদুসম্রাট এ. সি. সরকার আমার দোকানে অতিথী!" কথা শেষ করেই মহাব্যস্ত হ'য়ে তিনি কাউণ্টার ছেড়ে সামনে চলে এলেন। তারপরে হাকডাক করে কর্মচারীদের ব্যস্ত করে তুললেন—চেয়ার আন, চা-জলখাবার আন ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষকালে ভদ্রলোককে টেনে আমার পাশে একটা চেয়ারে চেপে বসাতে তবে ভদ্রলোক কিছুটা নিরস্ত হলেন বটে কিন্তু শুরু হল অন্য ঝামেলা।

"স্যার, দয়াকরে যখন পায়ের ধূলো দিয়েছেন দোকানে তখন সহজে আপনাকে ছাড়ছি না। যাহোক একটু কিছু আমাদের দেখাতেই হবে।"

যত বলি, "আমি এখন প্রস্তুত হয়ে আসি নি" ততই তাঁর নাছোড়বান্দাভাব বাড়তে থাকে।

"আপনি স্যার, হচ্ছেন যাদুসম্রাট এ. সি. সরকার। আপনার আবার প্রস্তুত অপ্রস্তুত কি? হাত ঘোরালেই তো যাদু আপনার।"

বুঝলাম, রেহাই পাবার উপায় নেই। ওদের নানা কথায় ভুলিয়ে রেখে আস্তে আস্তে পকেট হাতড়াতে থাকলাম।—না, কিচ্ছু নেই। এমন বিপদে খুব কমই পড়তে হয়েছে আমাকে। ঠিক করলাম, হিপ্নোটিজম প্রয়োগ করে দু' একটি মজা দেখাবো। করলামও তাই।

ম্যাজিক দেখার পরে যে স্বাভাবিক ভাবেই ভদ্রলোক দু' একটি যাদুর কৌশল শিখতে চাইবেন তা আন্দাজ করেছিলাম আগে থেকেই; আর সেই কারণেই শেষ খেলা হিসাবে দেখালাম একটা অতি সহজ যাদু-কৌশল। কৌশল সহজ হলেও এর চমৎকারিত্ব কিন্তু অসাধারণ।

ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড চেয়ে নিয়ে সেটা আমি উঁচুকরে ধরলাম বাঁ হাতে। এরপরে ভদ্রলোকের রুমাল দিয়ে কার্ডশুদ্ধ বাঁ হাত চাপা দিয়ে সেই রুমালের ঢাকনার নীচে আমার খালি ডান হাতটা চালান করে দিয়ে দুই হাত একত্রে রগড়াতে থাকলাম আর পড়তে থাকলাম ম্যাজিকের মন্ত্র:

ভাগনে উঠে সজনে গাছে
আঁকশি দিয়ে পাড়লো চাঁদ
তাই না দেখে মাতুল তাহার
সাগরজলে পাতলো ফাঁদ
শিকার পাবার আশায় মামা
রোজ সাগরে লাগায় ডুব
রগড় দেখে সবাই বলে,
সাবাস, সাবাস, বহুৎ খুব।

মন্ত্র পড়া শেষ হতে রুমালটা ফেলে দিই মাটিতে। অবাক কাণ্ড, ভিজিটিং কার্ডটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে একটা ভর্তি দেশলাই-এ!

যা ভেবেছিলাম তাই হল। এই খেলাটা শেষ হওয়া মাত্র ভদ্রলোক আমাকে ধরে বসলেন খেলা শেখানোর জন্য। তাঁকে শিখিয়ে দিলাম, কেমন করে এই মজাটা করলাম। এসো তোমাদেরও শিখিয়ে দিচ্ছি এই খেলাটা।

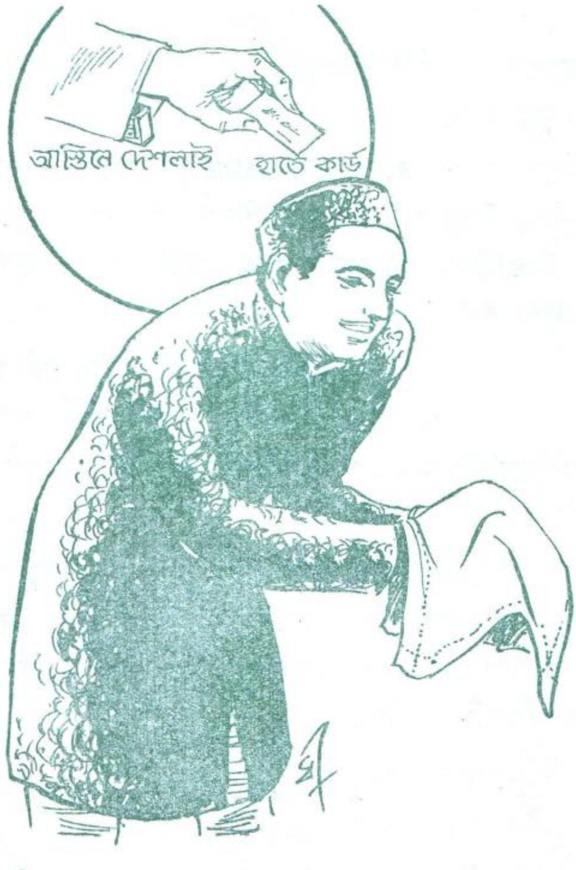

নানা কথার ফাঁকে এক সময়ে আমি আমার পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে এনে ঢুকিয়ে নিলাম আমার কোটের বাঁ আস্তিনের মধ্যে। সবার অলক্ষ্যেই করলাম এ কাজ। দেশলাইটা থাকলো সবার দৃষ্টির অগোচরে। রুমাল চাপা দিয়ে মন্ত্র পড়ার অবসরে রুমালের আড়ালে আমি এক ফাঁকে আস্তিন থেকে দেশলাইটা বের করে আনলাম আর কার্ডটাকে ভরে ফেললাম আস্তিনের মধ্যে। কাজটা খুবই সহজ। অল্প কয়েকবার অভ্যাস করে নিলে তোমরা এই মজাটা করতে পারবে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে। ভিজিটিং কার্ডের বদলে তাস ব্যবহার করলে খেলাটা আরও সুন্দর হবে।

বোশেখ এলো

শ্রীগৌরকিশোর দাস (গ্রাঃ নং—২০১৭৫)

চৈতালী দিন শেষ হলো ঐ থামলো মাতাল হাওয়া,
বছর পরে বোশেখ এলো মিটিয়ে দিতে চাওয়া-পাওয়া।
প্রখর রবির কিরণপাতে, ধূ-ধূ ঝরা মাঠে ঘাটে—
ঘূর্ণী হাওয়া মাতন জাগায় জীর্ণ যত ঝরা পাতে।
তাই তো আগুন লাগলো রে ঐ কৃষ্ণচূড়ার ডালে।
দোয়েল, ঘুঘুর গানটি ভরে দুপুর মায়াজালে।
কাঁপন-ছলে চাঁপা, কেয়া করছে কানাকানি—
মুছবে গ্লানি, ঘুচবে জরা, আসবে নতুন জানি ;
আবর্জনা দূরে যাবে, নবীন হেসে উঠবে ত্বরা,
কালবোশেখীর ধারাস্নানে শুচি হবে ধরা।
আনবে বোশেখ আশায় ভরা নববর্ষের স্পর্শ,
তাই তো দেখি সবার মাঝে আজকে জাগে হর্ষ—
দিচ্ছে উঁকি আশার নিশান যেদিক পানে চাই,
নিজেরে আজ খুশীর মাঝে হারিয়ে ফেলি ভাই।

ইতিহাসের পাতা থেকে

(নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়)

কালের প্রভাবে

শ্রীরণজিৎ বসু (গ্রাঃ নং—১৮১১১)

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আজ ধ্বংশ স্তূপে পরিণত। কিন্তু পৃথিবী ভুলিবে না নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, ভুলিবে না অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কথা।

বুদ্ধদেবের অতিবাহিত আম্রকুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি পরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিতি লাভ করে। ছয়টি চারিতল অট্টালিকা, শাস্ত্রজ্ঞদিগের অনেকগুলি গৃহ ও ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিবার গৃহের চারিদিকে ছিল, মনোহর বৃক্ষ বাটিকা। মহাবিদ্যালয়টি ছিল রঙবেরঙের পুষ্প-পল্লবে সজ্জিত। নগরের কোলাহল ইহার শান্তিভঙ্গ করিত না। সাংসারিক প্রলোভন ইহার ভিতর ঢুকিতে পারিত না।

এইরূপ শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে থাকিয়া দশ হাজার শ্রমণ শিখিত চিকিৎসা, দর্শন, বিজ্ঞান ও গণিত। এই শান্ত স্নিগ্ধ অথচ শিক্ষিত পরিবেশের কথা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল দেশ-দেশান্তরে, তাহারই আকর্ষণে আসিয়াছিলেন চীন পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাং,—অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নিকট হইতে তিনি পালি ও ব্যাকরণ শিখিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ শীলভদ্রের জ্ঞান ও দূরদর্শিতা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের ভিতর অলংকৃত করিয়াছিল জ্ঞানের অলংকার।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আজ ধ্বংস স্তূপে পরিণত। তাহার সেই বাহ্যিক সৌন্দর্য্যও লুপ্ত। কিন্তু তার জ্ঞান ও গরিমার কথায় ভারতের আকাশ-বাতাস আজও মুখরিত।

ঘুমপাড়ানি গান

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় (গ্রাঃ নং—১১৩০৫)

বেগুন গাছে ঝুলতো যদি দই-জিলিপীর হাঁড়ি,
দুলতো যদি পানতুয়ারা সেথায় সারি সারি,
চাঁদটা যদি আসতো নেমে খোকন তোমার হাতে,
বলতো কথা ফুলপরীরা যদি তোমার সাথে ;
কেমন মজা হ'তো তখন বল্‌না খোকন মোর,
দিনের শেষে সাঁঝ না এসে আসতো যদি ভোর !
ময়না, টিয়া, চন্দনারা ব্যাঙ্গমীদের মতো
বলতো যদি রাজার ছেলের গল্পকথা যত,
পাথরগুলোয় থাকতো যদি রাজকুমারীর প্রাণ—
লাঠি ঠক্‌ঠক্—ডাইনীবুড়ি গাইতো পথে গান,
বসুন্ধরায় থাকতো যদি রূপকথার এক দেশ,
লোকেরা সেথায় পরতো যদি উজির-কাজীর বেশ,
তবে খোকন মজা পেয়ে হাসতে না ফিক্ করে ?
বলতে না মা, যাব সেথায় ময়ুরপঙ্খী চড়ে'।
খোকনসোনা তোমায় আমি নিয়ে যাবো সেই দেশে
দু'চোখ বুঁজে এখন যদি ঘুমিয়ে পড় হেসে।

মৈত্রেয়

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক

মর জীবনের পথের পাথেয়
হেরেছি হে প্রিয়, ঝুলিতে শূণ্য,
কৃষ্ণা রজনী বিথারিছে অমা,
দাও আলো দেব, এসো হে তূর্ণ।
জীবনের তরী ভীতি-টলমল,
ঝাপটে ঝঞ্ঝা, অথৈ সাগর,
ক্রোধ-কর্কশ ঊর্মি কুটিল
গরজে মত্ত যেন অজাগর !
দমকে উর্ধ্বে শুধু ক্ষণে ক্ষণ
দামিনীর দ্যুতি নিকষ-আঁধারে,
এসো যামিনীতে জ্যোতির দিশারী,
ভ্রান্ত পান্থে নিয়ে চলো পারে।
ঈর্ষা-বহ্নি করো নির্বাণ,
তথাগত ভেদ ঘুচাও ভূলোকে,
শোনাও কণ্ঠে শান্তির বাণী,
অমরার আলো দাও দু'টি চোখে।
বিতর করুণা, দাও বরাভয়,
আশার কুহক শোনাও শ্রেয়ঃ,
ক্ষমা ও প্রীতির অমোঘ মন্ত্রে
মৈত্রীর ঝর্ণা আশে মৈত্রেয়।

যখন ভাবি তোমাকে

শ্রীতমাল চট্টোপাধ্যায়

কষ্ট কবির কল্পনা সব ছন্দ-যতি তালকানা,
হয় না তাতে অর্ঘ দিয়ে বিশ্ব কবির বন্দনা।
ভাবনা আমার সোজা পথে—তেপান্তরে কিংবা দূরে,
যায় না কভু বারেক ভুলেও অজানা পথ বন্ধুরে।
তাইত কবির কাব্য সুধায় বিভোর হ'য়েই থাকি,
এমনি কাটে বে-মিল জীবন মনে মনেই ডাকি।
জগৎ কবির করছে পূজা চন্দ্র, তপন আকাশে,
কমল দলের সরম ভেঙে মৌমাছি ভোর বাতাসে।
মেঘের বুকে লিখছে তড়িৎ সাগর ঢেউ-এর তানে,
এদের পাশে আমার স্তুতি কভু কি আর মানে!

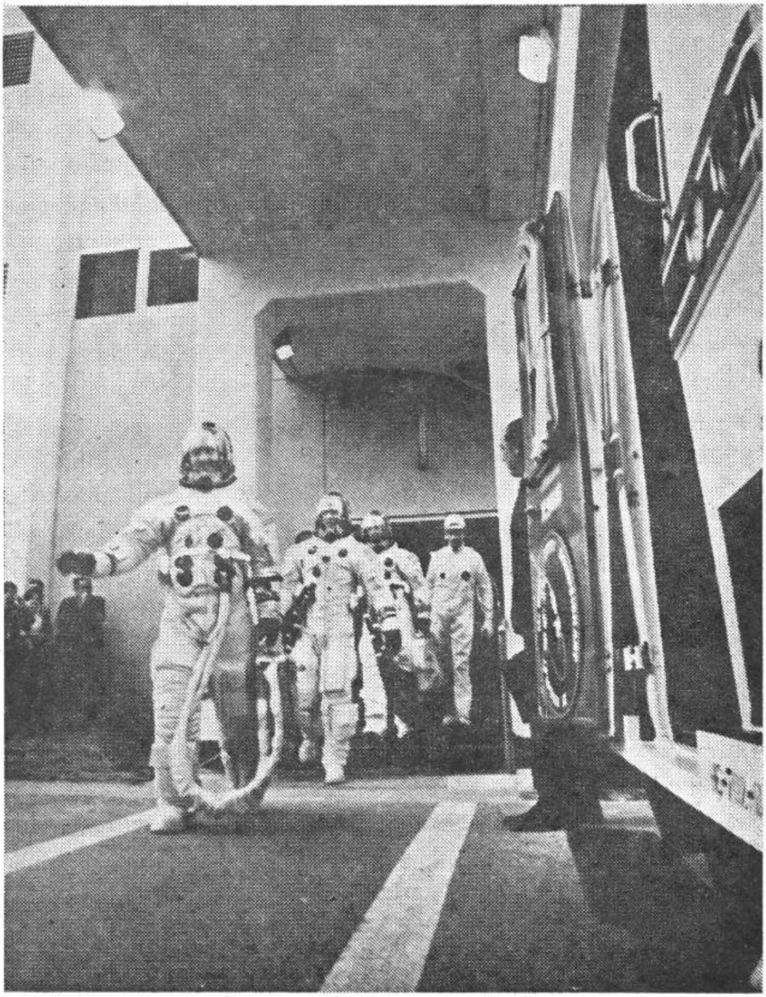

অ্যাপোলো-৯এর মহাকাশচারী তিনজন মহাকাশযানের দিকে চলেছেন।

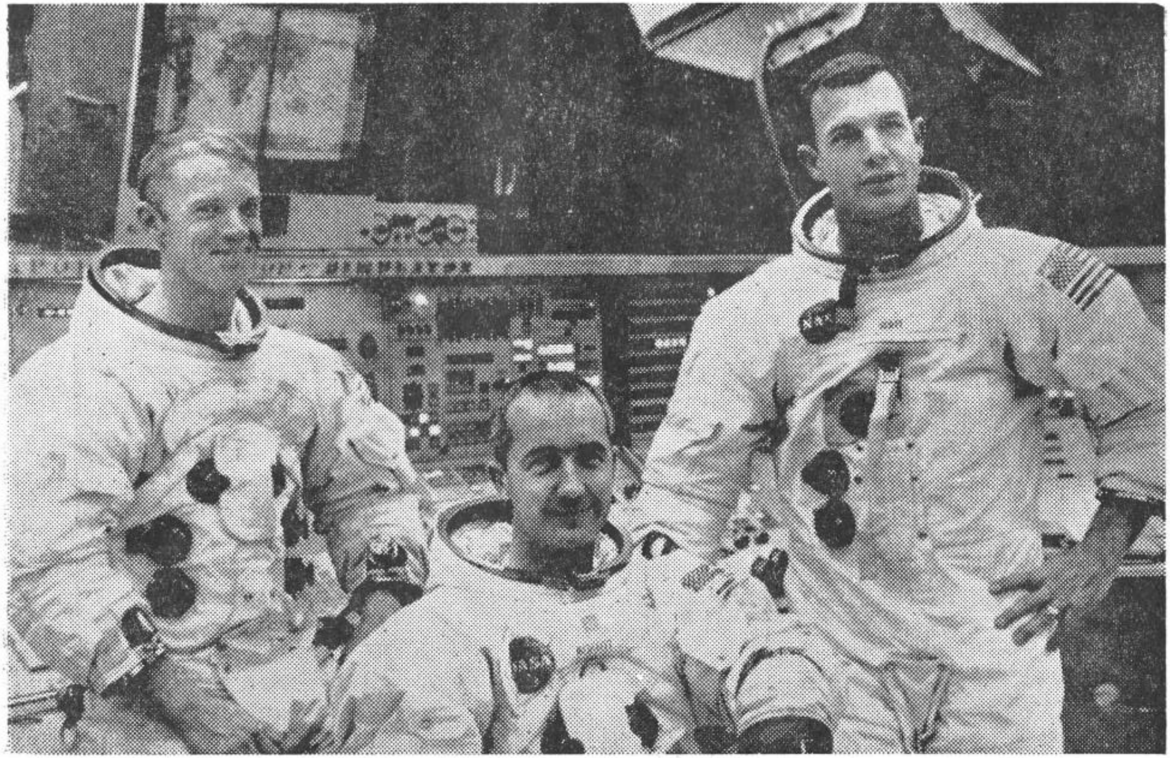

অ্যাপোলো-৯এর তিনজন মহাকাশচারী (বাঁ থেকে ডাইনে)—সোয়াইকার্ট, ম্যাকডিভিট এবং স্কট

বিজ্ঞান বিচিত্রা

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদে নামার মহড়ায় (১)

এর আগের 'শিশুসাথী'র পর পর চারটি সংখ্যায় চাঁদের কথা তোমাদের কাছে বলেছি। এবার বলছি চাঁদে যাওয়ার রোমাঞ্চকর অভিযানের কথা।

তোমরা জান চাঁদে মানুষ নামানোর জন্য গত কয়েক বছর ধরেই রাশিয়া ও আমেরিকা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। এদের মধ্যে আমেরিকাই এখন এই ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিতভাবে সুষ্ঠু পরীক্ষা করে এগিয়ে চলেছে।

চাঁদে মানুষ নামানো অত্যন্ত কঠিন ও জটিল প্রক্রিয়া বলে পর পর অনেকগুলি পর্যায়ের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক প্রস্তুতি চলছিল। এই সব পরীক্ষায় নানারকম কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশ-যান মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। প্রতিটি মহাকাশ-যানই অতি শক্তিশালী ক্যামেরা ও বিচিত্র সব সুক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে ভরা ছিল।

এ-সব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা এখানে দরকার নেই। এখানে আমরা চাঁদে নামবার শেষ পর্যায়ের পরীক্ষার কথাই বলব। এই পর্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাপোলো পরিকল্পনা। এই পর্যায়েরই নবম প্রচেষ্টাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছিল অ্যাপোলো-৯। এর কথা তোমরা সম্প্রতি কাগজে পড়েছো।

গত ৩রা মার্চ অ্যাপোলো-৯ মহাকাশ-যান মহাশূন্যের উদ্দেশে রওনা হয়। ১০ দিন মহাকাশ পরিক্রমা করে ১৩ই মার্চ এটি পৃথিবীতে ফিরে আসে। এতে যাত্রী ছিলেন তিনজন—জেমস ম্যাকডিভিট, ডেভিড স্কট এবং রাসেল সেয়াইকার্ট।

অ্যাপোলো—৯ মহাকাশ-যানের তিনটি অংশ। মুল অংশটির নাম কমাণ্ড মডিউল, দ্বিতীয়টি সার্ভিস মডিউল এবং আর একটির নাম লুনার মডিউল বা চন্দ্রযান। প্রথম

মডিউলটি থেকে অভিযান নিয়ন্ত্রিত হয়। দ্বিতীয়টিতে থাকে নানা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি। তৃতীয়টি, অর্থাৎ চন্দ্রযানটিই মূল মহাকাশ-যান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদে নামবে।

অ্যাপোলো-৯-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ছিল মূল মহাকাশ-যানটি থেকে চন্দ্রযানটিকে বিচ্ছিন্ন করা এবং আবার তাকে মূল যানটির সঙ্গে সংযুক্ত করা। সমস্ত প্রক্রিয়াটিই করা হয় কক্ষ পরিক্রমারত অবস্থায়। এর উদ্দেশ্য হল চাঁদের মাটিতে মানুষ নামিয়ে আবার তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে চারপায়া চন্দ্রযানটি ও তার সূক্ষ্ম সংবেদনশীল যন্ত্রপাতিগুলি ঠিক ঠিক কাজ করছে কিনা যাচাই করে দেখা। এ-দিক থেকে অ্যাপোলো-৯-এর অভিযান সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

এই পরিকল্পনায় মার্কিন মহাকাশচারী তিনজন মোট ১০দিন ১ ঘণ্টা ১ মিনিট মহাকাশে কক্ষ পরিক্রমা করেছেন। মানুষ-সমেত যে কয়টি মহাকাশ অভিযান আমেরিকা পরিচালনা করেছে, অ্যাপোলো-৯-এর অভিযানটি তাদের মধ্যে তৃতীয় দীর্ঘতম অভিযান।

চাঁদে মানুষ নিরাপদে নামানো এবং আবার তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য যে সকল কৌশল প্রয়োজন তার প্রত্যেকটিই অ্যাপোলো-৯ খুব দক্ষতার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছে। সবচেয়ে দুঃসাহসিক প্রক্রিয়াটি ছিল চন্দ্রযানটিকে মূল যান থেকে আলাদা করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং কিছুক্ষণ পরে আবার তাকে নিয়ে এসে মূল যানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। মহাকাশচারী ম্যাকডিভিট ও সোয়াইকার্ট কক্ষ প্ররিক্রমা করতে করতে এটা খুব নিখুঁতভাবে সম্পাদন করেছেন।

অ্যাপোলো পরিকল্পনার পরিচালক জেনারেল স্যামুয়েল ফিলিপস এঁদের কাজে খুব খুশি হয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ কাজে এতটা সাফল্য আমরা সত্যিই আশা করি নি।

বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে পরবর্তী মহাকাশ-যান অ্যাপোলো-১০ মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে চাঁদের কক্ষ পরিক্রমা করবে এবং চাঁদের মাটি থেকে মাত্র ১৫ হাজার মিটার দূরে থাকার সময় চন্দ্রযানটিকে মূল যান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে আবার তাকে মূল যানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

চাঁদের মাটিতে প্রকৃতপক্ষে নামবে অ্যাপোলো-১১। এর যাত্রার তারিখ মোটামুটি ভাবে জুলাই মাসের মাঝামাঝি বলে ঠিক হয়ে আছে।

পরের সংখ্যায় অ্যাপোলো-৯-এর অভিযানের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব।

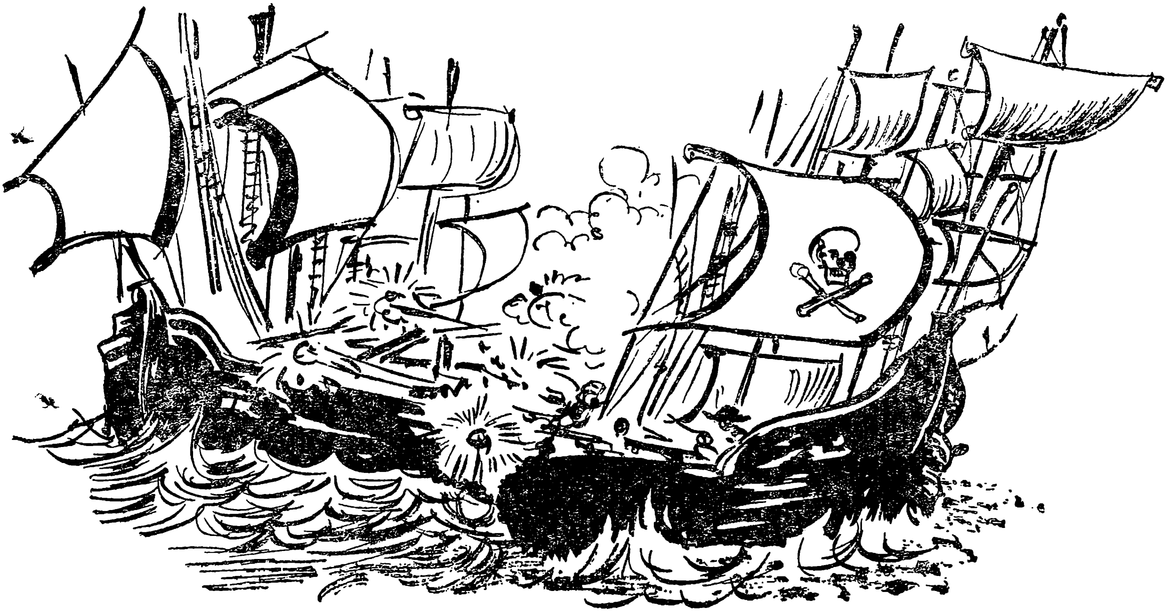

বেনগাজীর আখড়া

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

পূর্বকথা

[এ কাহিনী আজকের নয়। অনেক, অনেকদিন আগেকার কথা। পঞ্চদশ শতকের শেষদশকে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে এলেন। পর্তুগীজদের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের পত্তন হলো।

“এই বাণিজ্যের প্রসার হতে কিছুদিন সময় লাগলো। কিন্তু তার আগেই পর্তুগীজ জলদস্যুদের লুঠতরাজ শুরু হয়ে গেল ভারতের অরক্ষিত উপকূলভূমিতে। পশ্চিমের কচ্ছ, কঙ্কণ উপকূল থেকে দুর্ধর্ষ হার্মাদরা ছড়িয়ে পড়লো পূর্ব উপকূলের বাংলাদেশ অবধি।

গুজরাট রাজ্যে এই যে নূতন উপদ্রব শুরু হয়, এর জন্য সুলতানেরা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। রাত্রির অন্ধকারে যত্রতত্র দস্যুদের আবির্ভাব, জনপদ লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নি সংযোগ, এক অশান্তির সৃষ্টি করলো।

তবে হিন্দুরা তখন দেহে ও মনে দুর্বল ছিল না। দস্যুভয়ে তারা জনপদ ছেড়ে পালায় নি।

আত্মরক্ষার জন্য তারা প্রস্তুত থাকতো। রাতের অন্ধকারে সাড়া পেলেই তারা সশস্ত্র হয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু হার্মাদরা মানুষের সাড়া পেলেই সরে পড়ে। এ যেন এক চোর-চোর খেলা শুরু হয়েছে। তবে এই খেলার মুখে যারা পড়ছে, তারা ধনেপ্রাণে মরছে।

প্রভাসের এক সমৃদ্ধ পরিবার এইভাবে ধনেপ্রাণে মারা গেল।” প্রভাসে গোবিন্দজীর বাগানঘেরা মন্দিরের পিছনে সামন্তবাড়ী। হোলি উৎসবের রাতে হার্মাদেরা সে বাড়ী আক্রমণ করলো। ডাকাতির পর সে বাড়ীর ষোল বছরের ছেলে বেণীমাধবকে হার্মাদরা তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল। পারস্য উপসাগরের মুখে ওমান বন্দরে বেণীকে তারা বিক্রী করল। নামকরা সদাগর আবদুল্লা ইরাণী বেণীকে কিনলেন। অবদুল্লা তার নূতন নাম দিলেন—‘বেনজীর।’

আবদুল্লা ‘ওমান’ থেকে ‘মস্কট’ যাত্রা করলেন। এই সমুদ্রযাত্রার সময় বোম্বেটেরা আক্রমণ করলো আবদুল্লার জাহাজ। শেষপর্যন্ত জাহাজডুবি হল। বেণীমাধব আবদুল্লার জীবন রক্ষা করলো। তারপর নেহাৎ ভাগ্যের জোরেই উদ্ধার পেয়ে তারা পৌঁছল মস্কট।

আবদুল্লা ইরাণী সৎ ও ধার্মিক। বেণীকে তিনি দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলেন। তাকে পোষ্যপুত্র নিলেন নিঃসন্তান আবদুল্লা ইরাণী। “প্রভাসের বেণীমাধব সামন্ত হলো মস্কটের ইরাণী।” ধনী বণিক আবদুল্লার একমাত্র উত্তরাধিকারী।

ক্রীতদাসের এই সৌভাগ্য কিন্তু ভাল চোখে দেখল না আবদুল্লা ইরাণীর পুরোনো কর্মচারীর দল। মস্কটের বাজারে বেণী একদিন বেদুইনের ছদ্মবেশে ‘কাপতেন আলভারো’কে দেখে চমকে উঠলো। কাপ্তেন আলভারোই তাকে আবদুল্লার কাছে বিক্রী করেছিল। বেণী তাকে অনুসরণ করে জানতে পারল, আবদুল্লা ইরাণীর পুরোনো গোমস্তা সামসুদ্দীন শেখ, কাপ্তেন আলভারোর সঙ্গে কোন গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

মস্কটের সুলতান বোম্বেটেদের অত্যাচার অনাচার বন্ধ করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। সুলতানের কাছে বেনজীর আলভারোর খবর দিল। ইতিমধ্যেই মস্কটে নানারকম দুঃসাহসিক চুরি, ডাকাতি হচ্ছিল। বেনজীরের তৎপরতায় সে-সবের কিনারা হল। হাতেনাতে ধরা পড়লো বোম্বেটে সর্দার। লুঠের মালও উদ্ধার করা সম্ভব হলো। মস্কটের সুলতান বেনজীরকে খেতাব দিলেন ‘বাচ্চা-ই-রুস্তম।’

এর পর, কয়েকদিন বোম্বেটেরা চুপচাপ থাকলেও, কৌশল করে বেনজীরকে ধরে নিয়ে গেল তাদের জাহাজে। বোম্বেটেদের জাহাজকে অনুসরণ করলো আবদুল্লা ইরাণীর জাহাজ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোম্বেটেরা বেনজীরকে নিয়ে অকূল দরিয়ায় পালালো।

একেই বলে ভাগ্য! জাহাজের খোলের ভেতরকার ঘুপ্‌সী ঘরে পড়ে বেণী ভাবছিল, তার অদৃষ্টের চাকা তাহলে ঘুরে গিয়েও ঘুরলো না। বিদেশী হার্মাদ! তাদের না আছে ধর্ম, না আছে মনুষ্যত্ব! সারাজীবন এদের দাসত্ব করার চেয়ে মৃত্যু ভাল!

কামানের শব্দ হলো হঠাৎ। দু'টো গোলা ফাটলো জাহাজের ডেকে! হুড়োহুড়ি পড়ে গেল সারা জাহাজে। তবু জাহাজের চলার বিরাম নেই। অনেক রাতে, অমানুসিক চেষ্টার পর, হাত-পায়ের বাঁধন খুলে পালালো বেণী জাহাজ থেকে। টুপ করে নেমে পড়লো জলে। জল থেকে মাথা তুলে বেণী দেখল, কেউ তাকে লক্ষ্য করে নি। অনেক দূর এগিয়ে গেছে জাহাজ।

কোনরকমে সমুদ্রে রাত কাটলো। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো বেণী। সূর্যোদয় হলে পর, এক গুজরাটি রক্ষী জাহাজ লক্ষ্য করলো বেণীকে। তৎক্ষণাৎ জেলেডিঙ্গি নামালো তারা। বেণীর অদৃষ্টের চাকা ঘুরলো আর একবার। উদ্ধারকর্তাদের সাহায্যে প্রভাসে ফিরে এল বেণী। প্রতিবেশীরা ছুটে এলো!

কিন্তু শূন্য বাড়ী! খাঁ খাঁ করছে! মা আর বোনের কথা মনে করে সমস্ত মনটা হাহাকার করে উঠলো বেণীর! মাত্র আঠারো বছর বয়স তার আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হলো দীর্ঘজীবনের!

দিন কারো জন্য বসে থাকে না। বেণীরও দিন কাটতে লাগলো। একদিন সুলতানের সামনে এক দুষ্টু দুরন্ত আরবী ঘোড়াকে অনায়াসে বশ করলো বেণী। চড়ল তার পিঠে। দুষ্টু ঘোড়া এতটুকুও বেয়াড়াপনা করলো না। ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হলেন সুলতান। পরিচয় নিলেন বেণীর। তারপর তাকে একশো টাকা পুরস্কার দিলেন, আর উপহার দিলেন সেই ঘোড়াটা। অনুরোধ করলেন, বেণী যেন মাঝে মাঝে সুলতানের অশ্বশালা দেখে আসে।

কিন্তু বেণীর অদৃষ্টে নিশ্চিন্ততা নেই। কোন এক সুখলাল রাণা হার্মাদদের উপর প্রতিশোধ নেবার পণ করে বেণীর ঘোড়াটি নিয়ে মোম্বাই চলে গেছে। হার্মাদরা নাকি সুখলালকেও নিঃস্ব করে দিয়েছে। এ-সব কথা সুখলালের লেখা একটি চিঠিতে জানতে পারলো বেণী।

ভাগ্যের চাকা সত্যিই ঘোরে। আবদুল্লা ইরাণীর সঙ্গে পথেই দেখা হলো বেণীর। আবদুল্লা জানালেন—বোম্বেটে জাহাজের সন্ধানে তাঁর জাহাজ ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে কচ্ছ উপসাগরে এসে পড়ে। সমুদ্রেই হঠাৎ দু'টি বোম্বেটে জাহাজের সংঘর্ষ হল। একটি জাহাজে আগুন ধরে গেল। বারোজন বোম্বেটে জলে লাফিয়ে পড়লো। তাদের বন্দী করলেন আবদুল্লা। গুজরাটের সুলতানের দরবারে তাদের হাজির করবেন। বোম্বেটেরা অবশ্য অনেকবার তাঁকে অনুরোধ করেছে, তাদের যেন টাকার বদলে ছেড়ে দেন।

আজ হঠাৎ বেণীর দেখা পেয়ে আবদুল্লা খুব খুশি হলেন। ভাবলেন—বোম্বেটেদের টাকার বদলে ছেড়ে দিলে ক্ষতি কি? বেনজীরকে তো পেয়েছেন তিনি!

বোম্বেটেরা জানালো তাদের আড্ডা আছে 'মুম্বাই' বন্দরে। সেখানে গেলে টাকার সন্ধান মিলবে। আজকের বোম্বাই তখন 'মুম্বাই' নামেই পরিচিত ছিল।

কিন্তু মুম্বাই পৌঁছে দেখা দিল আর এক ফ্যাসাদ। বোম্বেটেদের দলের লোকরা এসে বন্দী

বোম্বেটেদের নিয়ে পালালো। আবদুল্লা বললেন—টাকার লোভ না করে সুলতানের হাতে বোম্বেটেদের তুলে দিলেই ভাল ছিল।

আবদুল্লা বেণীকে নিয়ে ‘মস্কটে’ ফিরে যেতে চাইলেন। বেণী রাজী হলো না। বেণী জানালো, সে বোম্বেটেদের আস্তানায় হানা দিতে চায়। আবদুল্লা আপত্তি করলেন না।

বেণী মোম্বাইয়ের জেলেদের কাছ থেকে বোম্বেটেদের সম্বন্ধে নানারকম খবর সংগ্রহ করল। তারপর তাদের লুকোনো এক দ্বীপের আস্তানায় আবদুল্লার জাহাজ নিয়ে রাত্রিবেলা আক্রমণ করলো। সারারাত গোলাবর্ষণ করলো সেই দ্বীপে। উষার আলো ফুটতে বেণী দ্বীপে নেমে দেখতে লাগলো। ইতঃস্ততঃ পড়ে আছে বোম্বেটের মৃতদেহ। আর আধপোড়া এক কাঠের বাড়ীতে আবিষ্কার করল তার মুমূর্ষু বন্দিনী মাকে আর ছোটবোন গৌরীর মৃতদেহটিকে। যার সঙ্গে আকস্মিকভাবে শেষ দেখা হলো বেণীর।

মা ও বোনের মৃতদেহ সৎকার করে জাহাজে ফিরলো বেণী। তার সমস্ত মন যেন ভেঙ্গে পড়ল। আবদুল্লাকে জানালো, সে যেখানে হয় চলে যাবে। আবদুল্লা বললেন, তা হয় না। মা ও বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে বেণীকে। তাছাড়া, তিনিও তো বেণীকে ছেলে বলেই জানেন। বৃদ্ধ বয়সে বেণী কি তাঁর মুখের দিকে চাইবে না!

সোমনাথে ফিরে এলো বেণী। কয়েকপুরুষ ধরে তারা গোবিন্দজীর মন্দিরের সেবায়েৎ। মন্দিরের বহু লুকোনো স্বর্ণ অলঙ্কারের সন্ধান একমাত্র সে ছাড়া আর কেউই জানে না। বেণী স্থির করলো, সেই লুকোনো সম্পদ সে ব্যবহার করবে জল-দস্যুদের নির্মূল করার জন্য। আবদুল্লার কাছে বেণী নিজের সংকল্পের কথা বললো। জাহাজ থেকে বাড়ী ফিরে দেখে, বাড়ীতে রীতিমত এক সন্ন্যাসীর আস্তানা বসে গেছে। এক সাধুবাবা বেণীকে বললেন—‘ম্লেচ্ছদের সংস্পর্শে থেকে তুমি পতিত হয়েছ।’ সাধুবাবার চেলারা বেণীকে প্রহার শুরু করলো। তারপর তাকে বেঁধে বাড়ীর পিছনের ঘরে ফেলে রাখলো।

গভীর রাত্রে এক অজানা অশ্বারোহী এলেন সে বাড়ীতে। বেণীর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে তাকে সুস্থ করলেন। জল দিলেন। আত্মপরিচয় দিলেন, তিনিই নাকি বেণীর ঘোড়া নিয়েছিলেন।

সন্ন্যাসীরা তখন মন্দিরের দেববিগ্রহকে স্থানচ্যুত করে, বেদী খুঁড়ে মন্দিরের লুকোনো সম্পদের খোঁজ করছে! নূতন আগন্তুক ও বেণী পথে নামলো। হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লো বন্দরের কাছে। বেণী তার প্রতিজ্ঞার কথা আগন্তুককে জানালো। তার সঙ্গী এর পর তাকে বললো—“তুমি একটু দাঁড়াবে, আমি কটকের রক্ষীর সঙ্গে একটা কথা বলে আসি—তারপর তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো তুমি যেখানে যাবে।

সঙ্গী দ্রুতপদে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।”

এই পর্যন্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হল। এর পর থেকে তোমরা পড়ে জানো।]

—সম্পাদিকা

॥ উনিশ ॥

বেণী একখানি পাথরের উপর বসেছিল। হয়তো ধীরে ধীরে সে ঘাটে গিয়ে একখানা নৌকায় উঠে পড়তে পারতো, কিন্তু যে মানুষ উপকার করেছে, তার অনুরোধ রাখা কর্তব্য। দেরী একটু হচ্ছে হোক্।

সত্যি, বেশ কিছুটা দেরী করেই মানুষটা ফিরলো। বললো—অনেকক্ষণ বসে আছ, বিরক্তি এসেছে না? কিন্তু উপায় ছিল না, একটা কাজ সেরে এলাম। সকালে বাড়ী ফিরে গিয়ে তুমি একটা মজা দেখতে পাবে।

—বাড়ীতে আমি আর ফিরবো না।

—বাড়ী না ফিরে কোথায় যাবে?

– জাহাজে থাকবো! আমার জাহাজ আছে।

—তাহলে ওই গোবিন্দজীর রত্নালঙ্কার উদ্ধার হবে কি করে?

—সে পরে যা করি করবো, গায়ের ব্যথা কমুক, সন্ন্যাসীরা বিদায় হোক্!

সঙ্গী হাসলো, বললো—কাল সকালে আর একজনও সন্ন্যাসী থাকবে না, আমি সব বিদায় করার ব্যবস্থা করে এলাম যে!

—ব্যবস্থা করে এলেন?

—হ্যাঁ, আমার কাছে সুলতানের পাঞ্জা আছে, সেই পাঞ্জা দেখিয়ে রক্ষীকে বলে এলাম, কতোয়ালি থেকে সিপাই পাঠিয়ে এখনি তারা সন্ন্যাসীদের ধরে আনবে। আমার তো এইটাই কাজ। এই জন্যই তো আমি তোমার তেজী ঘোড়াটা ধার নিয়ে দ্বারকায় চলে গিয়েছিলাম।

বেণীর এবার অবাক হওয়ার পালা। বললো—সব ব্যাপারটা খুলে না বললে আমি তো কিছু বুঝতে পারলাম না, আপনার পরিচয় কি?

সঙ্গী বললো—চল, সমুদ্রতীরে বসে সব বলবো।

—দু'জনে সমুদ্র-সৈকতে এসে বসলো। শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাস বেশ ভাল লাগছিল। আকাশে এক আকাশ তারা, সাগরের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফস্‌ফরাসের আলো চিক চিক করে উঠছে। সারি সারি নৌকার উপর লণ্ঠন জ্বলছে। আকাশে চাঁদ ছিল, কিন্তু ঘন কালো মেঘ চাঁদটাকে একেবারে ঢেকে দিয়েছে। সব নীরব, শুধু চির চঞ্চল সমুদ্রের ঢেউ ছাড়া আর কোন শব্দ সেখানে নেই।

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে সঙ্গী তার কাহিনী শুরু করলো:—আমার নাম সুন্দরলাল। আমরা গুজরাতী ব্যবসায়ী। আমাদের তিনখানি জাহাজ ছিল। ওর্মুজ, ওস্মাব, মস্কট বন্দর পর্যন্ত আমাদের জাহাজ চলতো। কাপড়, মশলা, তেঁতুল, আদা নিয়ে যেতাম, নিয়ে আসতাম, ঘোড়া আর পশম। আমরা নিশ্চিন্তে কারবার করছিলাম। কিন্তু আমাদের শত্রুতা শুরু করলো পশ্চিমের

সাহেবরা এসে। ওদের এক কাপ্তেন ভাস্‌কোডিগামা কালিকটের জামোরিণের সঙ্গে খাতির জমিয়ে সেখানে একটা ঘাঁটি বানায়, আর তার দল উৎপাৎ শুরু করলো সমুদ্রে। একটা গোলমাল বেধে গেল। ভাস্‌কোডি গামা তখন দেশ থেকে আরো সৈনিক ও যুদ্ধ-জাহাজ এনে রীতিমত লুঠতরাজ চালাতে থাকে। জাহাজ দেখলেই ডোবাতে থাকে, লুঠতরাজ চালায়, শিশু ও রমণীকেও জলে ডুবিয়ে মারে। এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। একবার চব্বিশখানি সদাগরী জাহাজ ধরে আটশো খালাসীর হাত কাণ, নাক, কেটে নিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। জামোরিণ তাকে ঠাণ্ডা করার জন্য এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রীকে দূত করে পাঠান, ভাস্‌কোডিগামা তার হাত ও কাণ কেটে নিয়ে তাকে হত্যা করে এবং সবশুদ্ধ বাক্সে ভরে পাঠিয়ে দেয় জামোরিণের কাছে, চিঠি লিখে দেয়—'তুমি এই মাংস রান্না করে খেও।'

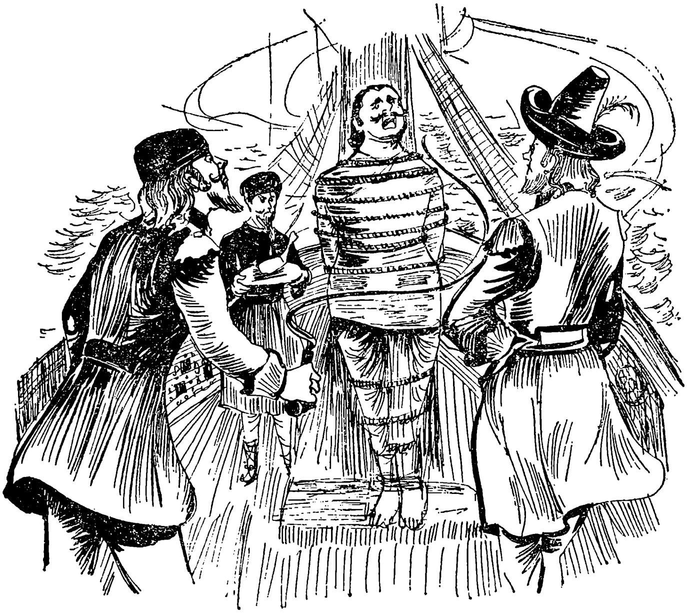

ভাস্‌কো-ডা-গামার এক সাকরেদ ছিল ভিনসেণ্ট সোদ্‌রে। সে যেখানে যত জাহাজ পেত লুঠ করতো, জাহাজের লোকদের মাস্তলে বেঁধে চাবুক মারতো। হিন্দু হলে মুখে গোমাংস ভরে দিত, মুসলমান হলে দিত শুয়োরের মাংস। আমাদের দু'খানা জাহাজ সে ডুবিয়ে দেয়। বাবাকে ধরে মাস্তলে বেঁধে চাবুক মারে, তারপর মুখে গোমাংস ভরে, নৌকায় ভাসিয়ে দেয়। বাবার নৌকা যখন ঘাটে এসে লাগে বাবা তখন আধমরা! অনেক চেষ্টা করেও বাবাকে আর বাঁচাতে পারি নি * আমি সেইদিন থেকে কাজ-কারবার সব ছেড়ে দিয়েছি, প্রতিজ্ঞা করেছি এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো। এমন মার দেব যে

---

* পশ্চিমী ঐতিহাসিকেরা ভাস্‌কো-ডি গামাকে যত গৌরবই দিন, নৃশংসতায় সে তাইমুর লং বা সুলতান মামুদের চেয়ে কম নয়। এই কাহিনী ডকটর রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'দি হিস্ট্রি এণ্ড কালচার অফ ইণ্ডিয়ান পিপল্‌' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড 'দি দিল্লী সুলতানেট্‌' গ্রন্থের ৪২০-৪২৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে।

হার্মাদদের নাম একেবারে মুছে যাবে এদেশ থেকে! আমি সেই চেষ্টার জন্যই তোমার ঘোড়াটা নিয়েছিলাম। ওখা বন্দরে মুসলমান ফৌজদারকে একটা খবর দেবার ছিল, খবরটা বিশেষ জরুরী। মিশরীয় সুলতান ফৌজী জাহাজ পাঠিয়েছেন আর কদিনের মধ্যে সেই জাহাজ এখানকার বীরবল বন্দরে এসে ভিড়বে। এখান থেকে মোম্বাই যাবে, সেখানেই এখন হার্মাদদের বড় ঘাঁটি হয়েছে গোয়ায়। সেখানে মুখোমুখি লড়াই হবে।

শুনতে শুনতে বেণী উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললো—তুমি সত্যি বলছ, মুখোমুখি লড়াই হবে? আমার দেশে লড়াই করে এই ডাকাতরা কখনো পারবে না।

—আমারও তাই বিশ্বাস। তবে লড়াইটা হবে কঠিন, কারণ ওদের লড়াই করার কায়দাটা আমাদের চেয়ে ভাল। সেই জন্যই আমি চাই মিশরীয় ফৌজ আর আমাদের ফৌজ, এই দুই ফৌজ, দু'দিক থেকে মেরে ওদের শেষ করুক। আমি সেইজন্য ওখা বন্দরে থেকে মোম্বাই অবধি ছুটোছুটি করছি, সমস্ত সদাগরদের কাছ থেকে টাকা তুলছি, ফৌজদারদের সঙ্গে দেখা করছি—আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছি।

বেণী বললো—তোমার বাবাকে ওরা মেরেছে। আমার মাকে, আমার বোনকে ওরা মেরেছে, আমিও তার শোধ তুলতে চাই। টাকার জন্য বাধবে না, গোবিন্দজীর লাখ লাখ টাকা আছে। তুমি আমাকে তোমার দলে নিয়ে নাও, বলে দাও কি কাজ আমায় করতে হবে।

॥ কুড়ি ॥

তারপর কয়েকটা দিন বেণীর জীবনে বিশেষ উত্তেজনার দিন।

সুয়েজ বন্দর থেকে মিশরীয় নৌ-বাহিনী এসে পড়লো। মিশরীয় অধিনায়ক আমীর হোসেন সোমনাথে এসে দেখা করলেন গুজরাটের নৌ-সেনাপতি মালিক আয়াজ-এর সঙ্গে। দুই সেনাপতি একত্রে যাত্রা করলো মোম্বাইয়ের দিকে।

পর্তুগীজ সেনানায়ক ফ্রানসিস্‌কো ডি আলমীডা তার ছেলেকে পাঠালো। ডন লরেন্‌জো এলো পর্তুগীজ বাহিনী নিয়ে। চউল বন্দরের কাছে প্রচণ্ড সংঘাত বেধে গেল। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি জলযুদ্ধ চললো। যারা ডাকাতি করে ঘুরে বেড়ায় অন্ধকারেই তাদের সুবিধা, কিন্তু সে সুবিধা পর্তুগীজরা পেলে না। সন্ধ্যার আগেই তাদের বহু জাহাজে আগুন লাগলো, ডুবেও গেল কয়েকখানি। সেনাপতি ডন লরেন্‌জো নিহত হলো। পর্তুগীজ বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অনেক মরলো। অনেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো; লড়াই শেষ হলো।

কিন্তু তারপরেই বিজয়ী বাহিনী ভুল করলো। তখনই আরো এগিয়ে আলমীডার বাণী

নৌবাটকেও তাদের আক্রমণ করা উচিত ছিল, কিন্তু তারা তা করলো না। ভাবলো পর্তুগীজদের যথেষ্ট মার দেওয়া হয়েছে। এরপর তারা আর কোন অনাচার অত্যাচার করতে সাহাস পাবে না।

কিন্তু তাদের ভুল হয়েছিল। সুদূর পর্তুগাল থেকে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে যারা আরব সাগরে ডাকাতি করে বেড়ায়, তাদের দুঃসাহসের প্রকৃতি বুঝতে পারা এদেশের সহজ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফ্রানসিস্‌কো ডি আলমীডা বললে—পুত্র হত্যার শোধ আমি নেব!

আলমীডা যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে লাগলো।

কথাটা গোপন রইল না। আমীর হোসেন ও মালিক আয়াজও আরো শক্তি সঞ্চয়ে মন দিলেন।

নতুন সৈন্য চাই। সুন্দরলালের নেতৃত্বে বেণীর বাগান বাড়ীতে হলো এক সৈন্য শিক্ষার কেন্দ্র। আবদুল্লার জাহাজ হলো নৌচালনা ও কামান দাগার অভ্যাসাগার।

গুজরাটের দুর্ধর্ষ সুলতান মামুদ বেগাড়ী তখন বৃদ্ধ, যৌবনে যিনি দিনে দশ সের চালের ভাত খেতেন, এবং সকালে একশোটী কলা খেয়ে প্রাতঃরাশ সারতেন। সেই শক্তি আর নেই, মনের জোরও কমেছে। নাহলে সুলতানী আওতার বাইরে তিনি এই ধরণের শিক্ষাকেন্দ্র সমর্থন করতেন না। সুন্দরলাল ও বেণীমাধব থাকলে হয়তো বিরূপ হতেন, কিন্তু আবদুল্লা ইরাণীও এদের সঙ্গে আছে দেখে তিনি এই সংগঠনের অনুমতি দিলেন। তাছাড়া যখন শুনলেন, যে এই শিক্ষাকেন্দ্রের সমস্ত খরচ আবদুল্লাই বহন করবেন, তখন আর কথা কি!

সুন্দরলাল কাজ শুরু করে দিলে। উৎসাহী তরুণেরা একে একে এসে জমতে লাগলো। আবদুল্লা সাহেবের সাদা দাড়ী ও ধার্মিক মনোভাবের জন্য তারা তার নাম দিলে হাজী সাহেব। সেই হাজীটা কেমন করে যেন গাজী হয়ে বেণীর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাগান-বাড়ীর নাম হয়ে গেল—বেনগাজীর ছাউনি।

বছর খানেকের মধ্যে বেনগাজীর ছাউনিতে সুন্দরলাল পাঁচ-ছ শো নৌ-সৈনিক তৈরী করে ফেললো। ইতিমধ্যে ফ্রানসিস্‌কে ডি আলমীডাও তৈরী হয়ে আক্রমণ করলো। মোম্বাই উপকূলের কাছে লড়াই হলো। কিন্তু এবার মিশরীয় ও গুজরাটি মিলিত বাহিনীর চরম বিপর্য্যয় ঘটে গেল। জলযুদ্ধে পর্তুগীজদের খর্ব করার মত শক্তি গুজরাটের চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে গেল। মিশরীয় বাহিনী ফিরে চলে গেল। সুলতান মামুদ বাগেড়া এডমিরাল, আলমীড়ার কাছে সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালেন।

এই যুদ্ধে আবদুল্লার জাহাজখানি ডুবলো। যুদ্ধের সময় আবদুল্লা, বেণী ও সুন্দরলাল জাহাজেই ছিল। পর্তুগীজ গোলার বিস্ফোরণে জাহাজখানি যখন বিদীর্ণ হয়ে আগুন ধরে গেল, তখন তিনজন তিন দিকে ছিটকে পড়লো। আবদুল্লা ও সুন্দরলালের কি হলো জানা গেল না। আহত বেণীকে একজন মাঝি তুলে নিল একখানি নৌকায়।

॥ একুশ ॥

বেণীর আঘাত তেমন গুরুতর কিছু হয় নি। গোলার আঘাতে জাহাজের মাস্তুল ভেঙে পড়ার সময় জড়ানো একটা পাল তার মাথার উপর পড়ে; শুধু পড়ে না, তাকে টেনে নিয়ে ফেলে দেয় জলে। সে আঘাতে বেণীর মাথা ফাটেনি বটে কিন্তু সে জ্ঞান হারিয়েছিল। তবে জলে পড়ার জন্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার চেতনা হয়, সেইজন্যই জলে ডুবে যাওয়া থেকে সে রক্ষা পায়। তারপর একখানি নৌকার মাঝি তাকে তুলে নেয়।

পর্তুগীজদের নৃশংসতার কথা সবাই শুনেছে। যুদ্ধে পরাজয়ের পরে তাদের হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই। সেজন্য মিশরীয় ও গুজরাটি বাহিনী যা অবশেষ ছিল, তারা দ্রুত অনেক দূর পিছিয়ে এলো। রাত্রির অন্ধকার সুযোগ দিল, নৌকাবাহীরা সারারাত অবিশ্রান্ত দাঁড় টেনে ফিরে এলো, সোমনাথের উপকূলে।

বেলাভূমির উপর বেণী বসে রইল বেলা দুপুর অবধি। অনেক নৌকা আসছে অনেক সৈনিক নামছে। তাদের মধ্যে আবদুল্লা বা সুন্দরলাল যদি থাকে।

বেলা দুপুর পার হয়ে গেল। বেনগাজী ছাউনির দু'চারজন করে প্রায় শ'খানেক জোয়ান এসে জমা হলো। কিন্তু আবদুল্লা ও সুন্দরলাল এলো না। শেষে জোয়ানরা বেণীকে বেলাভূমি থেকে গৃহে নিয়ে এলো।

ভারাক্রান্ত উদাস মনে বেণী বাড়ী ফিরলো।

(ক্রমশঃ)

শেষ দিন

গোলোকেন্দু ঘোষ

বিচার হয়ে গেল, বিষ পানে মৃত্যু। আসামী যদি ইঙ্গিতেও বিন্দুমাত্র অনুশোচনা প্রকাশ করতেন, বিচারকরা তাঁকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি অনড় অবিচল। আসামী ভাবলেন, এযাবৎ আমি যা বলেছি, তা শুধু এখনকার মত মৃত্যুকে এড়াবার জন্যে ফিরিয়ে নিই কি করে?

অতএব তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। বন্ধুরা এগিয়ে এলেন। তাঁরা জেলখানার প্রত্যেক কর্মচারীকে ঘুষে বশ করলেন, কিন্তু আসামী কিছুতেই পালাতে রাজী নন। হয়ত তিনি

ভাবলেন, আমি এখন তিয়াত্তর, মরবার বয়স হয়েছে। আর তাছাড়া এমন সময়মত মৃত্যুর সুযোগ কি আর দ্বিতীয়বার পাব।

শেষ দিনের সূর্যোদয় হল। বন্ধুরা উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের প্রিয় বন্ধুর জীবনের আজ শেষ দিন। জীবনের আজ শেষ দিন বটে, কিন্তু আসামীর মনে কোন বিকার নেই। বিষাদে ভারাক্রান্ত বন্ধুদের উৎসাহ দিয়ে বললেন, মনটাকে চাঙ্গা করে তোল্ হে তোমরা! অত মুষড়ে গেলে চলবে কেন? আমি তো শুধু দেহটাই রেখে যাব!

বন্ধুদের অপেক্ষা করতে বলে তিনি স্নান করতে গেলেন। ফিরতে অনেক দেরি হল। গভীর দুঃখে আচ্ছন্ন বন্ধুরা, উনি তো শুধু আমাদের প্রিয় বন্ধু নন, আমাদের পিতৃতুল্য, আমাদের আদর্শ, উনি গেলে আমরা অনাথ হয়ে যাব। স্নান করে ফিরে এলেন। ভরিয়ে রাখলেন বন্ধুদের বাকী সময়টা। কিন্তু বেশি কথা হতে পারল না। হবারও নয় বোধ হয়।

এমনিভাবে বেলা গেল। শেষ দিনের সূর্যাস্ত সমাগত। জেলার এগিয়ে এসে সবিনয়ে আসামীকে বলল, মহান্ সক্রেটিস! এ পর্যন্ত এখানে যারা এসেছে তারা সবাই আমাকে দেখামাত্র গাল দিয়েছে তারা সবাই অপরাধী ছিল বলে। আমি জানি, আপনার মত ভদ্র ও মহৎ আর কেউ নেই। কর্তৃপক্ষের আমি শুধু আদেশ পালন করছি, আমায় ক্ষমা করবেন। একথা শেষ করতেই চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল জেলারের। তাড়াতাড়ি সরে গেল সে।

সক্রেটিস জেলারের দিকে ফিরে বললেন, তুমি আমার শুভেচ্ছা জেন ; যা আদেশ করবে তা পালন করব। বন্ধুদের কাছে জেলারের খুব প্রশংসা করে বললেন, লোকটা ভারি সহৃদয়, এখানে আসা পর্যন্ত আমাকে ভারি আদর-যত্ন করছে। তারপর বন্ধু ক্রিটোকে বললেন, কৈ হে বিষ-পাত্র আনতে বল, এত দেরি কেন? বিষ তৈরী না হয়ে থাকলে তৈরী করতে বল।

ক্রিটো বললে, এত তাড়া কেন? পাহাড়ের চূড়া থেকে তো এখনও সূর্য দেখা যায়। অন্য সবাই তো আরো পরে পান করে। এখনও তো হাতে সময় আছে।

সক্রেটিস বললেন, ঠিকই বলেছ ক্রিটো, ওরা ভেবেছিল দেরি করলে লাভ আছে। কিন্তু আমি ভাবছি, সামান্য সময় হাতে পেয়ে লাভ আর বেশি কি হবে! যে জীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, সে জীবন ধরে রাখতে আমার কেমন যেন হাসি পাচ্ছে। নাও ওদের তাড়া দাও।

ক্রিটো এক ভৃত্যকে ইঙ্গিত করল। জেলারকে ডেকে আনল সে। জেলারের হাতে বিষ-পাত্র। সক্রেটিস কি কি করতে হবে জানতে চাইলেন। জেলার বলল, আপনি পায়চারি করবেন, পা ভারি হয়ে এলে শুয়ে পড়বেন। বিষ তখন কাজ করতে আরম্ভ করবে। এই বলে বিষ-পাত্রটা এগিয়ে দিল সে। সক্রেটিস তা গ্রহণ করলেন অত্যন্ত সহজভাবে। কোথাও কোন চাঞ্চল্যের বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই। জেলারকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, এই পাত্র থেকে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে খানিকটা পানীয় উৎসর্গ করতে পারি কি ? জেলার বলল, ওতে ততটুকু পরিমাণই আছে, যতটুকু কাজ করার জন্যে দরকার। সক্রেটিস বললেন, বুঝলাম, তবু আমি দেবতাদের কাছে এই প্রার্থনা করতে পারি তো যে ওপারের যাত্রা যেন আমার নির্বিঘ্ন হয়। আমার প্রার্থনা যেন পূর্ণ হয়। এই বলে পাত্রটা মুখের কাছে এনে সাগ্রহে পান করে ফেললেন বিষটা।

বন্ধুদের দুঃখ এবার আর বাঁধ মানল না। চোখের সামনে দেখল বিষ-পাত্র উজাড় হয়ে গেল। বন্ধু প্লেটো চোখের জল রুখতে না পেরে হাতে মুখ ঢাকল, ক্রিটো নিজেকে সামলাতে না পেরে সরে গেল। এপলোডোরাস সব সময়েই কাঁদছিল, এবার সরবে কেঁদে উঠল। সক্রেটিস শুধু ধীর শান্ত। বললেন, একি করছ ! মেয়েদের আমি আগেই বিদায় দিয়েছি এ অশান্তি এড়াবার জন্যে ; শুনেছি শান্তিতে নাকি মরতে দেওয়া উচিত। ধৈর্য ধর।

বন্ধুরা লজ্জা পেয়ে শান্ত হল। সক্রেটিস পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর পা ভারি হয়ে এলে শুয়ে পড়লেন। জেলার পা টিপে দেখতে লাগল পা অসাড় হয়ে আসছে কিনা। তারপর এক সময় সক্রেটিস বললেন, বুকে বিষটা উঠলেই শেষ হয়ে যাব। ক্রমে প্রায় কোমর পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে এল। মুখটা ঢেকে রেখেছিলেন সক্রেটিস। আবরণ সরিয়ে ক্রিটোকে ডেকে সক্রেটিস তাঁর জীবনের শেষ কথা বললেন, শোন ক্রিটো ! ইস্‌ক্লিপিয়াসের কাছে আমি একটা মোরগ ধারি, ওর দেনাটা শোধ করে দিও। ক্রিটো উত্তর দিল, দেনা শোধ করে দেব, আর কিছু বলার আছে ? এর উত্তর আর মিলল না। জেলের লোক এসে সক্রেটিসের মুখ ঢেকে দিল।

ভণ্ডুলের স্বপ্নভঙ্গ

খগেন্দ্র নাথ মিত্র

ভণ্ডুলের বাবা কাজ করেন আসামের জঙ্গলে—কাজিরঙ্গায়, যেটাকে লোকে বলে চিড়িয়াখানা। সেখানে স্কুল-পাঠশালা নেই। সুতরাং ভণ্ডুলে কাকার বাড়িতে থাকে, পশ্চিমবাংলার এক শহরতলীতে। সেখানে স্কুল-পাঠশালা আছে বটে এবং ভণ্ডুলেও পড়ে চতুর্থ শ্রেণীতে। কাকা কড়া মেজাজের মানুষ। কাজেই রোজ স্কুলে না গিয়ে উপায় নেই। ভণ্ডুলের কিন্তু রোজ স্কুলে যেতে উৎসাহ হয় না। পড়তে বসলে, বিশেষ করে আঁক কষতে বসলে, মন পথে-বিপথে, খেলার মাঠে, তেলেভাজার দোকানে, ফুচ্‌কাওয়ালার সঙ্গে, মানে যেখানে ও যে-সব জিনিষ তার ভাল লাগে, সেখানেই চক্কর দেয়। আজকাল আবার চাঁদের পাহাড়-পর্বত-মরুভূমি, সেই অন্ধকার দিকটাও বিনামাশুলে ক্যাপশুলে না চড়েই একপাক ঘুরে আসে। কেউ টের পায় না, টের পাবার কথাও নয়। টের পাওয়াও যায় না। কারণ, এমন কল আজও আবিস্কৃত হয় নি যার সাহায্যে মনের কথা, গোপন কথা টেনে বার করা যায়। জেরা করে, ঠ্যাঙানি দিয়ে কথা বার করা গেলেও পরে তা স্রেফ অস্বীকার করা চলে। তখন বললেই হলো, 'আগে যা বলেছে, তা মিথ্যে, বলেছে মারের চোটে, এখন যা বলছে, তা সত্যি। তখন আগেরটা, না, পরেরটা সত্যি, এই নিয়ে ধাঁধায় পড়ে যেতে হয়। সুতরাং মনের আসল কথা টেনে বার করবার জন্যে, একটা কল আবিষ্কার করা দরকার। আর তা যতক্ষণ না হচ্ছে, মিথ্যাবাদীরা নিরাপদ।

ভণ্ডুলে মিনিট খানেক আগেই একটা চলমান 'হাঁকন্ত' জয়নগরের মোয়াওয়ালার হাঁড়ির মধ্যে সুগন্ধ মোয়াগুলোর ওপর একবার বসেই তাড়া খাওয়া বোল্‌তার মতো রাগে-দুঃখে, হতাশায় বেরিয়ে এসে সামনে খোলা অঙ্কর খাতায় সংখ্যাগুলোর ওপর দিয়ে ভোঁ করে উড়ে গিয়ে চাঁদের একটা গহ্বরে তিন-চারটে ধাপ সবে নেমেছে এমন সময়ে কাকা ঘরে ঢুকে বললেন, 'হাঁ করে আকাশের দিকে কী দেখছো? সামনে কী বই ওটা? পড়ার, না গল্পের? দেখি। আঁক কষছো? তা আকাশে কী? ঘুড়ির প্যাঁচ?' বলেই তিনি জানালা দিয়ে আকাশটা দেখে নিলেন। না, ফাঁকা আকাশ। ভণ্ডুলেও আবার দেখলো। কেবল কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদখানা আধখাওয়া আস্‌কে পিঠের মতো দেখা যাচ্ছে।

কাকা বললেন, 'কী আঁক কষছো? বুদ্ধির অঙ্ক? বাড়িতে টাসক দিয়েছে? কষো—'

ভণ্ডুলে বললে, 'আজ রবিবার!'

কাকা বললেন, 'সে তো আরও ভাল কথা। ইস্কুলে যেতে হবে না। বসে বসে আঁক কষো। যত অভ্যাস করবে, তত বিষয়টা ভাল শিখবে। আমিও আজ সারাদিন বাড়ি থাকবো—'

যাঃ! সব ভেস্তে গেল। এই রবিবারটা যে কেন আসে?

কাকা আবার বললেন, 'আমি বাজার থেকে আসছি। মনে করেছিলাম, তোমাকেই পাঠাবো। কিন্তু তুমি যখন আঁক কষছো তখন বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। দেখো বাবা, আঁকটা যদি শিখতে পারো, তাহলেই জীবনে উন্নতি। খালি আঁক কষবে। আঁকের কথা ভাববে। আচ্ছা, আমি ফিরে এসে তোমাকে বলবো আঁক জানলে কী কী হওয়া যায়, কোন কোন কাজে আঁক জানা দরকার—'

কাকা হুঁকোটা ঘরের কোণে রেখে বেরিয়ে গেলেন।

ধুত্তোর অঙ্ক! না, সে আর লেখাপড়া শিখবে না। চলে যাবে সেই কাজিরঙার জঙ্গলে। তীর-ধনুক তৈরী করে হাতী-গণ্ডার, বাঘ শিকার করে বেড়াবে। ক্ষিদে পেলে হরিণ মেরে তার মাংস আগুনে ঝলসে খাবে। আর—হঠাৎ মনে পড়লো, ও জঙ্গলের পশু-পাখী মারলে জেল, জরিমানা-ঠেঙানি। পশুরা অবিশ্যি খুশিমতো যাকে তাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। ওদের তাতে কিছু হবে না। বরং যে মরলো, যাকে মারলো, দোষ তারই। কর্তারা বলবে, ওখানে কেন গিয়েছিলে বাপু? জান তো ওরা অবোধ পশু; পশু আর শিশু একই—দুই-ই অবোধ। তারাও সাংঘাতিক কিছু করলে তাদেরও কিছু হয় না।

হঠাৎ এক ফুচ্‌কাওয়ালা রাস্তা দিয়ে চলে গেল। তার মাথায় ফুচ্‌কার পাহাড়, ময়লা কাপড় দিয়ে ঢাকা; মাঝখানে তেঁতুলগোলা জলের শ্যাওলাপড়া হাঁড়ি। লোকটার বগলে লম্বা মোড়া। বুড়ো আঙুলের একটু টেপন দিয়ে একটা পেটফোলা ফুচ্‌কার সেই গর্তে একটু তেঁতুলগোলা দিয়ে যখন খেতে দেয় তখন—! সে ঠোঁট চাটলো। জিভে নোন্‌তা ও টক স্বাদ অনুভব করলো। ফুচ্‌কা খায় না কে? খায় নি কে? সে দেখেছে খেলার মাঠে, সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ফুচ্‌কার পাহাড়কে পাহাড় হাওয়া, কেবল চারধারে পড়ে থাকে শালপাতা। আচ্ছা, জীবনে উন্নতি মানে তো অনেক পয়সা রোজগার? এক একটা ফুচ্‌কাওয়ালা কম রোজগার করে না। ওরা প্রাণভরে ফুচ্‌কা খায়, আবার বেচে। এ কাজে তেমন অঙ্ক জানার দরকার নেই। সে মনে মনে স্থির করলে, ফুচ্‌কাওয়ালা হবে। পাড়ায় পাড়ায়, সিনেমা হাউসের ধারে, খেলার মাঠে মাঠে ঘুরবে। কিন্তু ফুচ্‌কাওয়ালারা সকলেই তো হিন্দুস্তানী। সেও হিন্দুস্তানী সাজবে, দু-চারটে হিন্দী কথা তো জানেই। সে মনে মনে শব্দগুলো আওড়ে নিলে। তার চেহারাটাও বেশ গাঁট্টা-গোট্টা।

পরক্ষণেই মনে হলো, ফুচ্‌কা বিক্রি করা কাজটা ছোট। তৎক্ষণাৎ মনে পড়লো, তাদের স্কুলের প্রাইজ ডিস্টি্রবিউশনের অনুষ্ঠানে দেখা রবিঠাকুরের লেখা 'ডাকঘরের' একটি দৃশ্য। অত বড় লোক

মাধব দত্তের পুষ্যিপুত্তুর অমল দইওয়ালা হতে চাইছে! সে বলছে, 'দই—চাই দই—'! তাহলে সে কাজিরঙা জঙ্গলের আফিসের এক কেরাণির ছেলে, এই শহরতলীর একটি কারখানার কারিগরের ভাইপো ভণ্ডুলে যদি ফুচ্‌কাওয়ালা হতে চায় তো দোষের কী ?

উত্তরে বাতাসে পথের ধার থেকে ভেসে এলো পিঁয়াজি ভাজার গন্ধ। সত্যি, কী চমৎকার! মোড়ে একটা তেলেভাজা খাবারের দোকান হয়েছে। লোকটি বেগুণি, ফুলুরি, ঝালবড়া, পকৌড়ি, পিঁয়াজি ভাজে। আজকাল আলুর চপ ও ধোঁকাও ভাজছে। কত পথ চলতি, ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-যোয়ান কিনছে। বড় বড় মেয়েরাও পথের ধারে দাঁড়িয়ে খায় আর হিহি করে হাসে। ঐ দোকানে তার বয়সী এক ছোকরা চাকরি করে। সে নিশ্চয়ই ওগুলো খায়, পেট ভরে খায়। সে ঐ রকম একটা দোকানে চাকরি নেবে। তারপর বড় হয়ে তেলেভাজার দোকান করবে। কতজন তেলেভাজা বেচে নাকি বাড়ির পর বাড়ি কিনছে। ভাড়াটে বাড়িতে থাকতে তার ভাল লাগে না। এই তো শীতে আধভাঙ্গা জানলা দিয়ে হুহু করে হাড় কাঁপানো উত্তরে বাতাস আসছে। বর্ষায় ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ে, উঠোনে জল জমে, রোয়াকে ও ঘরে ব্যাং উঠে আসে। ফুচ্‌কাওয়ালারা দেশে টাকা পাঠায়, তেলেভাজাওয়ালারা এদেশেই বাড়ি কেনে।

হেঁকে যায়, সিঙ্গাপুরী কেলা—'কমলালেবু দার্জিলিং—

ভণ্ডুলে উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে দেখে, একটা লোকের মাথায় মস্ত ডালা। ডালায় কলা ও কমলালেবু--পাশাপাশি সবুজ ও কমলা রং।

এক একটা কলার ওজন কমসে কম আড়াই শ গ্রাম হবে। ছড়ায় যদি এক ডজন কলা থাকে তো ছড়াটার ওজন হবে—কমবেশি তিন কে. জি.। ওর দু'টো খেলেই তিনটে খেতে হবে না। কী পুষ্ট, কী চমৎকার দেখতে। কলাগুলো সিঙাপুর থেকে এসেছে না আরও কিছু। এখানেই কোন বাগানে হয়েছে। আচ্ছা, তাদের রান্নাঘরের পিছনে সেপটিক ট্যাংকটার পাশে যে হাত কয়েক ফাঁকা জায়গা রয়েছে, ওখানে বেশি নয় গোটা দুই সিঙাপুরী কলার পোয়া যদি রুয়ে দেওয়া যায়? তাহলে নিশ্চয় মস্ত গাছ হবে, তাতে কাঁদি পড়বে। কিন্তু পাড়াটায় যে চোর—ছেলে-বুড়ো, মেয়ে চুরি করে। ফল-ফুল তো চুরি করেই, গাছকে গাছ উপড়ে নিয়ে যায়। ধরা পড়লে ঝগড়া করে, বোমা ও ছুরি মারবার ভয় দেখায়। তার চেয়ে কিনে খাওয়াই ভাল। কিন্তু পয়সা ?

ঐ কমলাগুলো, এক একটা টেনিসবলের মতো, এসেছে দার্জিলং অর্থাৎ হিমালয় পাহাড় থেকে। মিষ্টিরসে ভরা। দেখলে চোখ ফেরাতে মন চায় না। সে যদি কোন কমলাবাগানে যেতে পারে! ছোট ছোট গাছ, ডালে ডালে পাতার কোলে সবুজ ও কমলারং। কী বাহার! পাকাগুলো যত খুশি ছিঁড়ে খাও। খেতে খেতে পেট এমন হবে যে, একটু নড়া-চড়া করলেই পেটে কমলার রস করবে, ঢক ঢক। সেই হিমালয় পাহাড় যেখানে—

'ভণ্ডুলে, কটা আঁক হয়েছে ?'

ভণ্ডুলে চমকে উঠলো। ফিরে দেখে কাকা।

'অ্যা, যেমন সাদা খাতা দেখে গেছি তেমনি সাদা—? হাঁ করে কী ভাবছো ? না, তোমার কিচ্ছু হবে না। দাদাকে আজই লিখে দেবো, কেন মিথ্যে টাকা খরচ করছো ? ওকে নিয়ে গিয়ে বনে ছেড়ে দাও—'

ভণ্ডুলে তাই চায়। তাহলে তার বাবা পড়ার খরচ যোগান, কাকা নয় ? সে চলেই যাবে। সেখানকার অবাধ্য বন্য জীবন তার ভালই লাগবে।

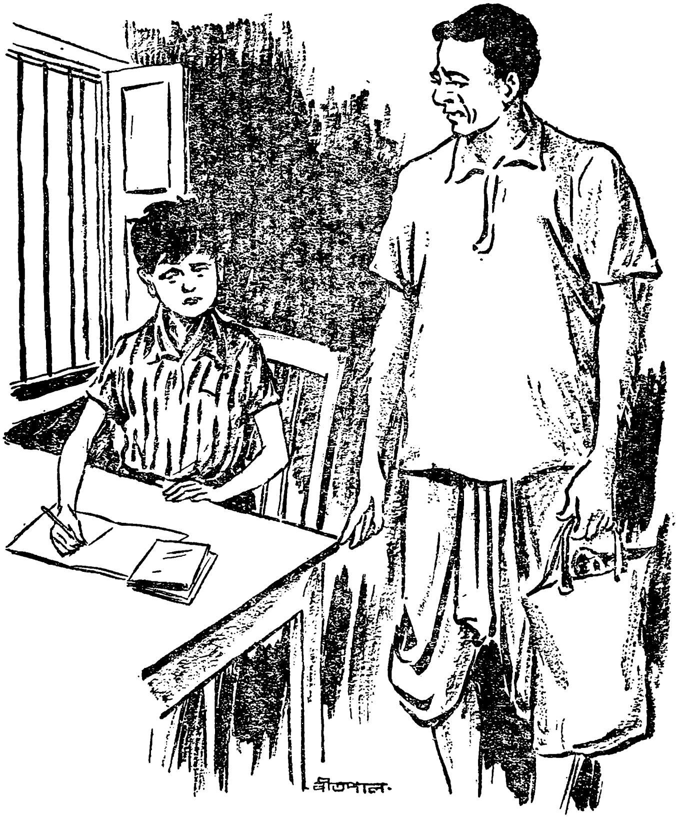

সে দুপুরে তার বাবাকে চিঠি লিখলো, তাঁর জন্যে খুব মন কেমন করে। তিনি যদি শীঘ্র তাকে সেখান থেকে নিয়ে না যান তাহলে সে নিজেই হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে।

সন্ধ্যায় সে খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফিরতেই তার কাকীমা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সজল চোখে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, আমি কী তোকে ভালবাসি না ? তুই চলে গেলে এই ফাঁকা বাড়িতে আমরা কী করে থাকবো ? আমাদের তুই ভালবাসিস্ না ?'

ভণ্ডুলে দু'হাতে কাকীমার গলা জড়িয়ে ধরলো। তারপর সরে এসে চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো।

উপেন্দ্রকিশোর

[জন্মদিন—২৭শে বৈশাখ]

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

শিশু-সাহিত্যের জনক—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান। পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ছোটবেলায় সবাই তাঁকে 'কামদারঞ্জন' বলেই ডাকত। পরে এই নাম পরিবর্তন করে উপেন্দ্রকিশোর রাখা হয়। উপেন্দ্রকিশোরের জন্মের আগেই তাঁর বাবা লোকনাথ মারা যান। তখন দূর সম্পর্কের এক কাকা—হরিকিশোর তাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। সাধু, সুপণ্ডিত ও জমিদার হিসাবে হরিকিশোরের খুব নাম-ডাক ছিল। উপেন্দ্রকিশোরকে পোষ্যপুত্র নেবার পর, তাঁর নিজেরও একটি পুত্র হয়। দু'ছেলের মধ্যে তিনি কোনদিন কোন তফাৎ রাখেন নি। মৃত্যুর আগে হরিকিশোর তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দু'ছেলেকেই সমান ভাবে ভাগ করে দিয়ে যান। জমিদার বাড়ীতে মানুষ হয়েও উপেন্দ্রকিশোর তাঁর বাবার গুণগুলি সব পেয়েছিলেন। জমিদারী করা তাঁর ধাতে সইত না। দেশের বাড়ীতেও তিনি বড় একটা থাকতেন না, মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন।

ছেলেবেলা থেকেই উপেন্দ্রকিশোর খুব গান-বাজনার ভক্ত ছিলেন। বাঁশী ও বেহালা ছিল তাঁর চিরসঙ্গী। কেবলমাত্র পরীক্ষার দিনগুলি ছাড়া তিনি কখনও বই নিয়ে বসতেন না। নিজে বিশেষ পড়াশুনা করতেন না, অপরের পড়া শুনেই তা শেখা হয়ে যেত। কিন্তু তবুও অঙ্কে আর বিজ্ঞানে ছিল যেমন অদ্ভুত মাথা, আবার তেমনই ছিল তাঁর ছবি আঁকবার আশ্চর্য ক্ষমতা। তাঁর আঁকা শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে 'পরশুরাম' ও 'ভরতের দেহত্যাগ' অন্যতম। উপেন্দ্রকিশোর খুব ভাল গল্পও বলতে পারতেন।

স্কুলে থাকতেই গোঁড়া হিন্দুদের চেয়ে ব্রাহ্মসমাজের উদার গুণগুলি তাঁর খুব ভাল লাগত। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময়ে তিনি ক্রমেই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। ২১ বছর বয়সে বি. এ. পাশ করেন। আর তখন থেকেই টাকা-কড়ি উপায়ের দিকে মন দেন। এরপর তিনি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা বিধুমুখীকে বিবাহ করে—১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের একটা লাল রং-এর তিনতালা মেস বাড়ীর উপরের ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন। সেখানে রোজ সন্ধ্যায় বন্ধুদের নিয়ে গান-গল্পের মজলিস বসাতেন। এছাড়া উপেন্দ্রকিশোর প্রায়ই সপরিবারে দেশ ভ্রমণে বের হতেন। আর দূরে কোথাও গেলেই পরিচিতদের তিনি ছবি এঁকে, কবিতা করে চিঠি লিখতেন। পাখী আর বেড়াল পোষার সখও উপেন্দ্রকিশোরের ছিল। একবার তিনি ছাদের উপরে ফুলের বাগানও করেছিলেন।

ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়ার দিকে তিনি সর্বদাই খুব সচেতন থাকতেন। উপেন্দ্র

কিশোরের ছেলেমেয়েরাও সবাই বাবার গুণ পেয়েছে। বিখ্যাত সুকুমার ও সুখলতার মত তাঁর আর এক মেয়ে পুণ্যলতারও খুব চমৎকার লেখার হাত ছিল। সুবিনয় ও সুবিমলের নাম বাংলা সাহিত্যে চির-উজ্জ্বল। ছোট মেয়ে শান্তিলতা অল্প বয়সে মারা যায়। উপেন্দ্রকিশোরের নাতি বিশ্ববিখ্যাত সত্যজিৎ রায় বর্তমানে বহু-গুণান্বিত।

উপেন্দ্রকিশোর বিলাত থেকে যন্ত্রপাতি আনিয়ে ২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীটের একতালায় 'ইউ রায় এণ্ড সন্স' নামে একটা ছাপাখানা খোলেন। আর বাড়ীটার দু'তালা তিন-তালায়

নিজেরাই থাকতেন। তাঁর প্রেসে হাফ্‌টোন ব্লক প্রিন্টিং-এর কাজ হ'ত। আমাদের দেশে উপেন্দ্রকিশোরই সর্বপ্রথম হাফ্‌টোন ব্লক ও ছবি নির্মানের কৌশল আবিস্কার করেন। তাঁর প্রথম বই 'ছেলেদের রামায়ণ', এর সব ছবি তিনি নিজেই এঁকেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের লেখা 'টুনটুনির বই' তোমরা অনেকেই পড়েছ। তাঁর প্রবর্তিত 'সন্দেশ' মাসিক পত্রিকা বাংলার শিশু-সাহিত্য জগতে অতুলনীয়। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসু, প্রিয়ংবদা দেবী প্রভৃতি সেকালের সব গুণীরাই নিয়মিত লিখতেন।

এরপর উপেন্দ্রকিশোর ১০০নং গড়পার রোডে তাঁর নিজের বাড়ীতে চলে যান। 'সন্দেশ' পত্রিকার ভার সুবিনয় ও সুবিমলের হাতে দিয়ে, কিছুকাল রোগভোগের পর মাত্র ৫৩ বছর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

উপেন্দ্রকিশোর আজ নেই, কিন্তু তাঁর কীর্তি তাঁকে অমর করে রেখেছে। শিশু-সাহিত্য, ছবি আঁকা, ছাপা প্রভৃতি সব ইচ্ছাই তাঁর পূর্ণ হয়েছে। আজও ছোটদের হাতে ছবি-ছড়ার রংচঙে কোন বই দেখলেই—আগে উপেন্দ্রকিশোরকে মনে পড়ে॥

॥ ছোটদের ভাল ভাল বই ॥

ছোটদের বিশ্বকোষ—দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দাম ১২·০০ টাকা।

নূতন চোখ দিয়ে ছোটরা দুনিয়াটাকে দেখে, আর তাদের সদা কৌতূহলী মনে নানারকম প্রশ্ন জাগে। সেই সব প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর পেলে ছোটদের মনে জগৎ ও জীবনকে জানবার আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়ে। এইসব নবীন মনের রকমারি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে 'ছোটদের বিশ্বকোষে।' এই বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ড দেখেই এর পরবর্তী খণ্ডের সম্বন্ধে আমাদের যে কৌতূহল ও আশা ছিল তা তৃপ্ত হয়েছে। আলোচ্য বিশ্বকোষে মহাশূন্য সৌরজগৎ, পৃথিবী, উদ্ভিদ জগৎ, জীব জগৎ, ইতিহাস, ভাষা ও লিপি, সাহিত্য, ধর্ম, জীবনী, অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারিং, যানবাহন, শরীরবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নিয়ে নামকরা সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকেরা যে সব সরস আলোচনা করেছেন, তা ছোটদের পক্ষে খুবই উপযোগী ও আকর্ষণীয় হয়েছে। বিশ্বকোষের ছবিগুলিও সুন্দর। প্রতিটি ভালো লাইব্রেরীর পক্ষে এ বই অপরিহার্য। শিশুসাথীর পাঠক-পাঠিকারা এই 'বিশ্বকোষ' সংগ্রহ করতে পারলে খুবই লাভবান হবে।

বিদেশে ছোটদের জন্য নানারকম 'বিশ্বকোষ' আছে। বাংলাভাষায় এ ধরণের বিশ্বকোষ খুব বেশী নেই। 'ছোটদের বিশ্বকোষের' বহুল প্রচার একান্তভাবে প্রার্থনীয়। আশাকরি এর পরবর্তী খণ্ডগুলিও প্রকাশিত হতে বেশী দেরী হবে না।

শঙ্খচূড় ও লৌহচূড়

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পুরাকালে হিমালয়ের পাদদেশে দু'টি রাজ্য ছিল।

শঙ্খচূড় ও লৌহচূড় ছিলেন সেই রাজ্য দু'টির রাজা। পাশাপাশি দু'টি রাজ্য। কারো সঙ্গে কারো ঝগড়া বিবাদ নেই। চির তুষারাবৃত হিমালয়ের এই রাজ্য দু'টি সুখে শান্তিতে ভরা। বার মাসে তের পার্বণ লেগেই থাকত। মেয়েরা সেজে থাকত ফুল দিয়ে। অফুরন্ত ফুল হত এ দু'টি রাজ্যে। বিধাতা যেন সব সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছেন এই রাজ্য দু'টির উপরে। এ যেন মর্ত-লোকের ইন্দ্রপুরী। শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সকলেই হাসিখুশি। ভাবনা চিন্তা নেই এই রাজ্যের অধিবাসীদের।

শঙ্খচূড় ও লৌহচূড় দুই ভাই। দৈত্যবংশে জন্ম হলেও এদের আচার-ব্যবহার ছিল দেবোচিত। দুই রাজ্যের মধ্যে এমন ভাব, দেখলে মনে হবে যেন একই বৃন্তে দু'টি ফুল। প্রজাদের কোন কিছু নালিশ থাকলে, অভাব থাকলে, দরবারে যায়। শঙ্খচূড় ও লৌহচূড় মন দিয়ে তাদের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন। সাধ্য মতন তাদের অভাব দূর করে দেন। প্রজারা খুশি হয়ে ঘরে চলে আসে।

শীত গিয়ে বসন্ত এল। দুই রাজ্যই উৎসবে মেতে উঠল। ফুল-সাজে সেজেছে দৈত্যদের নর-নারী। ফুল দিয়ে সাজান হ'ল গুরু শুক্রাচার্যের মন্দির। রাজ্যময় চলেছে নৃত্য, গীত। দেশবাসী আনন্দে মগ্ন।

স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেবের কানে গেল এই কথা। শঙ্খচূড়ও লৌহচূড় দুই ভায়ের রাজ্য নয় তো যেন স্বর্গপুরী। দৈত্যরা সুখে আছে। আনন্দের বান ডাকছে দিবা-রাত্রি।

ইন্দ্রদেব দূত মুখে সব সমাচার শুনলেন। একদিন কাউকে কিছু না বলে দেবরাজ চলে গেলেন হিমালয়ে শঙ্খচূড়ের রাজত্বে। ছদ্মবেশে ঘুরতে লাগলেন দুই রাজ্যে। তখন বসন্ত আগত। উৎসব মুখরিত রাজ্য দু'টি। ঝকঝকে রাস্তাঘাট। মর্তলোকের মতন কোলাহল নেই। ফুলে ফুলে ঘর-বাড়ি সাজান। দৈত্য-ললনারা ফুলপরী হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক সেদিকে। নৃত্যে, গীতে মুখরিত দু'টি রাজ্য। কোথাও হিংসা দ্বেষ নেই। ইন্দ্রদেব দেখে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মনে হ'ল, তিনি স্বর্গেই আছেন।

সন্ধ্যা আগত। দেবরাজ ঘুরতে ঘুরতে এলেন রাজ দরবারে। শঙ্খচূড় আর লৌহচূড় বসে আছেন রাজ সিংহাসনে। দুই সারিতে শোভাবৃদ্ধি করছেন অমাত্যবর্গ। তাদের মাঝে নেচে চলেছে ফুলরাণী সব দৈত্য কন্যারা। দেখেই ধাঁধা লেগে গেল দেবরাজের চোখে। এক একটি দৈত্য-কন্যাকে উর্বশীর মতন লাগছে।

দেবরাজের মনে হিংসা ঢুকে গেল। মর্তলোকে এমন রাজ্য আছে এ তাঁর কল্পনার বাইরে। শঙ্খচূড় লৌহচূড় স্বর্গসুখ ভোগ করছেন।

দরবার কক্ষ হতে বের হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র গেলেন, গুরু শুক্রাচার্যের মন্দিরে। ফুল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে তারা গুরু-মন্দির। ফুলের তোরণ। কৌতুহলী চোখ দিয়ে দেখছিলেন দেবরাজ। এমন সময় মধুর বাজনা ও শঙ্খধ্বনি শুনে ফিরে তাকালেন সহস্রলোচন। চোখ আর ফিরাতে পারেন না। সখীগণ পরিবেষ্টিতা হ'য়ে চলেছেন শঙ্খচূড় ও লৌহচূড়ের সহধর্ম্মিণীরা, হাতে ফুলের ডালা। নানা রকম উপকরণ নিয়ে সঙ্গে চলেছে সখীগণ। পূজায় যাচ্ছেন দু'টি ললনা। সারা অঙ্গ তুষারের মতন শুভ্র। শুভ্রবসন পরিহিতা। মাথায় ফুলের মুকুট। গলায় দুলছে ফুলের হার। হাতে, পায়ে, কোমরে ফুলের অলঙ্কার। মৃগ আঁখির মতনই কালো কুচকুচে দু'টি চোখ। দেবরাজ সেই দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ, বিহ্বল ও হতবাক হ'য়ে গেলেন। খবর নিয়ে জানলেন এঁরা এই রাজ্যের রাণীদ্বয়। পূজায় চলেছেন।

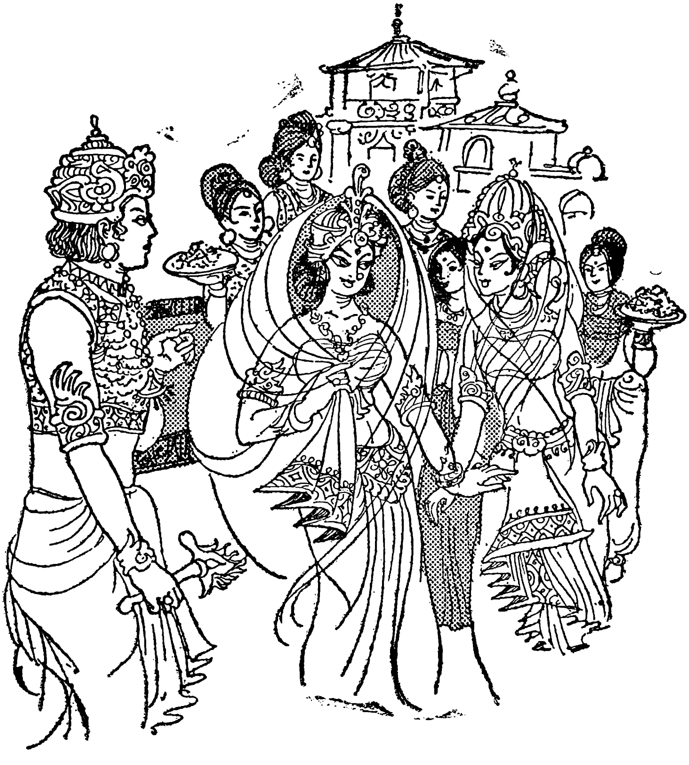

একটা ব্যথা নিয়ে স্বর্গে ফিরে এলেন দেবরাজ ইন্দ্র। মর্তলোকের এ সুখ সহ্য করতে পারলেন না দেবরাজ। দূতকে ডাকলেন তিনি। বললেন, হিমালয়ে শঙ্খচূড় লৌহচূড়ের রাজ্যে যাও। রাজাদের বল আমার কথা। হয় রাণীদের স্বর্গে পাঠিয়ে দিন, নয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

দূত চলে গেল হিমালয়ে। রাজাদের জানালে দেবরাজের হুকুম। শুনে বিষাদের ছায়া নেমে এলো দুই রাজ্যে। অমাত্যবর্গের দিকে চাইলেন মহারাজ শঙ্খচূড়। বললেন, এবার দেশও জাতি, দুই-ই ধ্বংশ হবে। আর রাণীদের দিলে দুই-ই রক্ষা পাবে। এখন আপনাদের মতামত দিন। আপনাদের ইচ্ছা মতন কাজ হবে।

অমাত্যবর্গরা বললেন, দূতকে বলে দিন, আমরা যুদ্ধ করব। দেবরাজের যদি শক্তি থাকে, যুদ্ধ করেই রাণীদের নিয়ে যাবেন। বিনা যুদ্ধে তাঁর আশা পুরণ হবে না।

শঙ্খচূড় বললেন, আপনারা জানেন, দেবরাজের সহায় তেত্রিশ কোটি দেবসেনা। তার উপর রয়েছেন দেব-সেনাপতি কার্তিক। আমাদের সৈন্য মুষ্টিমেয়। ধূলোর মতন উড়িয়ে দেবে দেবসেনারা।

তাবলে জাতির মুখে কালি দিতে পারব না মহারাজ। যুদ্ধে হার-জিত আছেই। এতে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু আমরা যদি ইন্দ্রের ভয়ে রাণীদের স্বর্গে পাঠিয়ে দিই, ত্রিভুবনের লোকেরা হাসবে। বলবে, শঙ্খচূড় লৌহচূড়ের রাজ্যে পুরুষ নেই। যারা ছিল, তারা কাপুরুষ অপদার্থ। এ অপমান অসহ্য মহারাজ।

দূত ফিরে গেলেন স্বর্গে। যুদ্ধের জন্য মেতে উঠল দানবরা! বেজে উঠল রণ দামামা।

দূত মুখে সকল কথা শুনলেন দেবরাজ ইন্দ্র! ক্রোধে জ্বলে উঠলেন তিনি। সামান্য মর্তবাসীর এত তেজ, এত দম্ভ! দেবরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়! কার্তিককে হুকুম দিলেন, 'শঙ্খচূড় লৌহচূড় দুই রাজ্য জয় করে রাণীদের নিয়ে এসো।' দেব-সেনাপতি চলে গেলেন হিমালয়ে। তুমুল যুদ্ধ হল দেবতা-অসুরে। এ-যুদ্ধে দেবতারা হেরে গেলেন। কার্ত্তিক পালিয়ে এলেন স্বর্গে। নত মস্তকে দেবরাজকে জানালেন, তাঁদের পরাজয়ের কথা।

আগুনে আহুতি পড়লে যেমন আগুন দপ করে জ্বলে ওঠে, দেবরাজ ইন্দ্রও জ্বলে উঠলেন রাগে ও অপমানে। ঐরাবতে চড়ে হাতে বজ্র নিয়ে স্বয়ং যুদ্ধে চললেন দেবরাজ। পিছনে চলল এক লক্ষ দেবসেনা।

আবার দেবতা-অসুরে লড়াই সুরু হল। ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন শঙ্খচূড়, লৌহচূড়। তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। ইন্দ্র যত অস্ত্রই চালনা করেন, দুই ভাই তা কেটে খান-খান করে দেন! শঙ্খচূড়, লৌহচূড়ের অস্ত্র এসে বিদ্ধ হয় দেবরাজের গায়ে। ইন্দ্র অস্থির হয়ে পড়লেন। আর কিছুক্ষণ এভাবে যুদ্ধ চললে এবারও পরাজয় বরণ করে নিতে হবে। তাই মরিয়া হ'য়ে উঠলেন ইন্দ্র। অন্যকোন

পথ না দেখে ইন্দ্র বজ্র তুলে নিলেন। মন্ত্র পড়ে দুই ভাইয়ের উপর সেই বজ্র হানলেন। শঙ্খচূড়, লৌহচূড় হত হলেন। দানব সেনা এবার পালাতে লাগল।

সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়ল, প্রাসাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। রাজ্য ছেড়ে পালাতে লাগল দানবরা।

ইন্দ্র এবার সসৈন্যে চললেন রাজধানীর দিকে। শঙ্খচূড়, লৌহচূড়ের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন দেবরাজ। প্রাসাদে লোকজন নেই, শূন্য প্রাসাদ। রাণীদের পেলেন না। রাণীদের তন্নতন্ন করে খুঁজলেন দেবরাজ। কোথাও রাণীরা নেই। শেষে সহস্র চোখে তাকালেন--ইন্দ্র। দেখলেন, রাণীরা পালিয়ে কৈলাসে গিয়েছেন। হর-পার্ব্বতীর স্থান। যেখানে ইন্দ্রের কোন আধিপত্য নেই। বিমর্ষ মুখে ফিরে এলেন দেবরাজ স্বর্গে।

পার্ব্বতীর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন রাণীরা। বললেন—আমাদের স্বামীদের বাঁচিয়ে দাও মা! নইলে তোমার সামনে আত্মহত্যা করব্।

পার্ব্বতী বললেন—তোমাদের স্বামীদের বাঁচাবার হাত আমার নেই, মা। তোমরা শিবের আরাধনা কর। তিনিই তোমাদের মঙ্গল করবেন।

দুই রাণীতে তপস্যা শুরু করে দিলেন। আহার নেই, নিদ্রা নেই, শুধু তপস্যা। শেষে শিব সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিলেন। বললেন—তোমাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি। বর নাও!

রাণীরা জানালেন, তাঁদের দুঃখের কথা। ইন্দ্র কেন তাঁদের স্বামীদের হত্যা করেছেন তাও নিবেদন করলেন শিবের কাছে। শেষে প্রার্থনা জানালেন—আমাদের স্বামীদের বাঁচিয়ে দাও প্রভু!

মহাদেব বললেন—মর্তবাসীদের বাঁচিয়ে তোলা সৃষ্টি-কর্তার নিষেধ। ও আমি পারব না। তবে আমি এমন বর দিতে পারি, যাতে তোমাদের স্বামীরা চিরকাল অমর হয়ে থাকে। বল তো সেই বর দিই?

রাণীরা অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন। স্বামীদের জন্য প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু মহাদেবের এক কথা। সৃষ্টি কর্তার নিয়মের বিরুদ্ধে যাবার তাঁর ক্ষমতা নেই। অগত্যা রাণীরা মহাদেবের প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

মহাদেব বর দিলেন, বিবাহিত মেয়েরা যতদিন লোহা ও শাঁখা পরবে, ততদিন তাদের বৈধব্য হবে না! সেই হতে আজও বিবাহিত মেয়েরা শাঁখা ও লোহা প'রে আসছে।

শরীরচর্চার বৈঠক

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

আমার প্রিয় লক্ষ্মী ভাইবোন সব,

তোমরা সবাই আমার নতুন বছরের অনেক আদর নিও। কল্যাণ হোক প্রার্থনা করি।

চিন্তা করে দেখো এমনি ভাবে প্রত্যেকটা নতুন বছর কত নতুন নতুন পরিবর্তন আর পরিবর্ধনের নির্মাল্য দেশ জাগরণের জন্য নিয়ে আসে। আমরা সেই প্রসাদী গ্রহণ করে জাতীয় জীবন যুদ্ধের সাহসী সৈনিক হবার সঙ্কল্প করি মনে মনে। মনে প্রাণে ঐ সঙ্কল্প গ্রহণ করি না বলেই বিকল্প সঙ্কল্প বোধ হয় প্রাধান্য বিস্তার করে জীবনযাত্রা পথে। ভয়, কাপুরুষতা-ছলনা, মিথ্যার বেসাতীর প্রাচুর্যে মাথা নীচুই হ'য়ে থাকতে চায়। এ-কথা সত্য যদি না হতো এই বাঙ্গালী জাত পৃথিবীর সব জাতের সেরা জাত বলে এই পৃথিবীতে আবার গণ্য হতো। এ-কথা অবশ্য সত্য, এককালে এই বাঙ্গালী সারা বিশ্বকে অনেক শিখিয়েছে। তখন তারা সত্যকে বন্ধু করে সার্থক করতো মনের পূজা। সব এক হ'য়ে কাজ করতো। দলাদলি ছিল না। লক্ষ্য এক। আর আজ? আজ আমরা বক্তৃতায় বলবো এক, কাজে করবো আর একটা। এটাই বৈশিষ্ট্য বর্তমান আদর্শবাদের। এই বৈশিষ্ট্যেই বিশিষ্টরা অলঙ্কৃত। সুতরাং অনুকরণপ্রয়াসীদের আর দোষ কোথায়? আমি বলবো—না। অনুকরণ-প্রয়াসী যারা, বিবেক তাদেরও জাগ্রত। বুদ্ধি উন্নত করতে পারলে ঐ বিবেকের সাহায্যে অবিবেচক ধারা প্রবাহকে স্তব্ধ করতে খুব একটা কষ্ট করতে হ'বে না—উপরন্তু বিশিষ্টদের বৈশিষ্টাচারের সুসংস্কার হ'য়ে, এক জাতি এক প্রাণ একতার অভিষেক উৎসব পালন করা সহজ হবে।

মানুষ দেশে অনেকই আছে, নেই শুধু মন। আর সেই মন নেই বলেই গলাগলিও নেই—আছে যত দলাদলি। তোমরা কি এই শুভ পয়লা বৈশাখে তেমন একটা বলিষ্ঠ সঙ্কল্প করতে পারো না—যাতে ক'রে এই অন্যায় প্রতি পদক্ষেপে প্রতিহত হতে পারে? চিন্তা কর দু' মিনিট। কেন বলছি জানো? নতুন বছর—নতুন সরকার—নতুন অনেক মন্ত্রীর সমাবেশ। বছরটি কিন্তু নতুনের মেলা নিয়ে আমাদের কাছে এবাঁর হাজির। কিছু বেছে নাও—কিছু বেছে দাও তোমাদের মতামত দেশের কল্যাণের জন্য, তবেই তো আরও নতুনের জন্ম হবে।

আর শোন, শরীর আর মন এই দুইকে তোমরা একত্র করে শ্রদ্ধার চোখে দেখো—ভালোবেসো। দেশ ও জীবনের কাছে চাওয়া-পাওয়ার হিসেবে দেখবে কোন ঝঞ্ঝাট নেই। অবহেলা করলেই অবসাদ অনিবার্য্য। অবহেলা করো না—মঙ্গল তার শঙ্খ নিয়ে তোমাদের জন্যই প্রতীক্ষা করছে।

এবার চিঠিপত্রের জবাব দেবো—কেমন?

রাহুল ব্যানার্জ্জি (কলিকাতা)। প্রঃ—মায়ের খুব সর্দ্দি হয় সারা বছর। আমারও Toncil, adinoid operation হয়েছে—তবুও নাক বন্ধ। কি করি বলুন তো?

উঃ—তোমরা আমার বাড়ী এসো যে কোন শুক্রবার বিকেল ৩॥টা থেকে ৫॥টার ভেতর। বুঝে শুনে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা দেবো।

বিমলকুমার দাঁ (এলাহাবাদ)। প্রঃ—অনেক আমার জিজ্ঞাসা, বিরক্ত হলে ভুল করবেন কারণ আপনি প্রতিশ্রুত, জবাব দেবেন যদি কাজের প্রশ্ন হয়। যেগুলো কাজের তারই জবাব দিন। পারবেন?

উঃ—বলতে পাচ্ছি না, চেষ্টা করছি।

(১) পেটের চর্ব্বি কমাবার সহজ উপায় কি ?

উঃ—ব্যায়াম এবং তেল-ঘি, চিনি ও ভাত খাওয়া আপাততঃ বন্ধ করা উচিৎ।

(২) আগে ডাম্বেল না বারবেল নিয়ে ব্যায়াম করা উচিৎ ?

উঃ—কোনটাই নয়। প্রথমে ২।৩ মাস খালি হাতে ব্যায়াম ও আসন করা উচিৎ।

(৩) ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম করলে কি শরীর পাকতোড় মেরে যায় ?

উঃ—সামঞ্জস্য বজায় রেখে করলে ভালই হয় ?

(৪) হরাইজেনটাল-বারে ব্যায়াম করলে কি লম্বা হওয়া যায় ?

উঃ—কোন যুক্তি নেই।

(৫) আমার বাঁদিকের বুক এবং কাঁধের চেয়ে ডানদিকের অংশ একটু নাচু কি করবো ?

উঃ—ইঁটের ওপর বুকডন দিও সমানভাবে চাপ দিয়ে।

(৬) যোগাসন করার বড় ইচ্ছা—কিন্তু পুস্তকবলে গুরু ছাড়া করতে নেই,—এখন গুরু কোথায় খুঁজি ?

উঃ—যেখানে পাওয়া যাবে।

আজ থাক তাহলে—আবার আসছে মাসে অনেক নতুন খাবার তৈরীর প্রণালী দেবো।

ইতি—তোমাদের মনতোষদা

বিজ্ঞপ্তি

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, গত বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী গ্রাহকদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাবার জন্য শ্রীমান সব্যসাচী রায়-চৌধুরী (গ্রাহক নং ১৫২৬০) এবং গ্রাহিকাদের মধ্যে শ্রীমতী রূপমঞ্জরী ঘোষকে (গ্রাহক নং ২০২৩৪) ১৩৭৬ সালের শিশুসাথী উপহার দেওয়া হল। এ-বছর তাদের কোন চাঁদা দিতে হবে না। তাদের গ্রাহক নম্বরেরও কোন পরিবর্ত্তন হবে না। আশাকরি শিশুসাথীর গ্রাহক-গ্রাহিকারা পড়াশুনায় আরও ভাল ফল লাভ করার জন্য বিশেষ মনোযোগী হবে। —শুভার্থিনী সম্পাদিকা

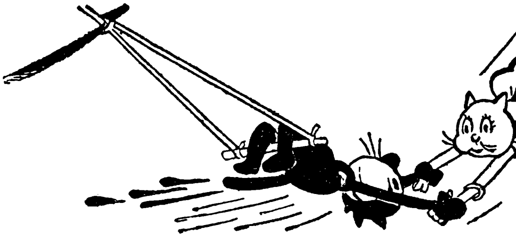

খেলা ধুলা

শ্রীঅমিতাভ

ব্যাঙ্গালোরের মাঠে ফুটবলে বাংলা মহীশূরের কাছে হারল। কিছুদিন আগে এই ব্যাঙ্গালোরেই ক্রিকেটে বাংলা গোহারান হারিয়েছিল মহীশূরকে। তাই সন্তোষ-ট্রফির ফাইন্যালে বাংলাকে পরাজিত করার পর ব্যাঙ্গালোরের দর্শকদের আনন্দের বন্যা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। পুলিশ প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। আর হামলা হয় বাংলার খেলোয়াড়দের ওপর। ক্রিকেটে পরাজয়ের রাগের ঝালটা ফুটবলের জয়ে সুদে আসলে মিটিয়ে নেবার ভেতরে যে কী অর্থ তা বোঝা দায়।

ব্যাঙ্গালোরে সদ্য সমাপ্ত সন্তোষ-ট্রফির আসর এবার ঠিক জমে উঠতে পারে নি। ড্র হয়েছে পরের পর খেলা, আর শেষে টস্ করে খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি করতে হয়েছে। মাদ্রাজ রাজ্যদল টসের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে ব্যাঙ্গালোর ত্যাগ করেন।

এবার সন্তোষ-ট্রফিতে বাংলাদল কোনক্রমে জোড়াতালি দিয়ে পাঠাতে হয়েছে। ট্রেণিং ক্যাম্প নামে মাত্রই হয়েছে, অর্ধেক খেলোয়াড় ঠিক মত ক্যাম্পে যোগদানই করেন নি। প্রতি বছরই ট্রেণিং ক্যাম্পে এই ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে। নামী দলের দামী খেলোয়াড়েরা জানেন যে তাঁদের বাদ দিয়ে দল হবে না, ক্যাম্পে না গিয়েই দলে আসা যাবে, ফলে ক্যাম্পে আসার নামে তেমন তাঁরা গা করেন না। এবার কিন্তু বাংলাদল গঠনের সময় আই. এফ. এ. কিছুটা কঠোর মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ফলে দু'একজন দামী খেলোয়াড় দল থেকে বাদ পড়েছেন; আই. এফ. এ-র এই মনোভাব সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য।

সন্তোষ-ট্রফির খেলা শুরু হয়েছে ১৯৪২, এ পর্যন্ত মহীশূর চারবার সন্তোষ-ট্রফি জয়ের গৌরব অর্জন করেছে। মহীশূর বাংলাদলের প্রথম দিনের ফাইন্যাল খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। ফিরতী ফাইন্যাল খেলায় মাত্র একটি গোল খেলার ভাগ্য নির্দ্ধারিত করে। খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২২ মিনিটে কর্ণার কিক্ থেকে মহীশূরদলের রাইট হাফ নটরাজ একমাত্র বিজয়সূচক গোলটি করেন। সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারের একটি নিশ্চিত গোল করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা হয় তাঁকে নিষিদ্ধ সীমানার মধ্যে ফাউল করে। কিন্তু রেফারীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এবং এরপরও রেফারী দিল্লীর ইক্রামুল হক্ বাংলা দলের প্রতি আরও কয়েকটি অবিচার করেন।

এদিকে পিনাকী আর ডিউক তাদের বিজয় অভিযান শেষ করে কলকাতায় ফিরেছে, তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ তোমরা খবরের কাগজের পাতাতেই পড়েছে। কয়েকদিন আগে ব্রিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর কলিকাতা পৌরসভা এদের দু'জনকে সম্বর্ধনা জানালেন। এ-ছাড়া সম্বর্ধনার বন্যায় দু'জনেই ক্লান্ত। আমরা দূর থেকেই অভিনন্দন জানাই এই দুই বীর যুবককে।

নতুন ধাঁধা

শ্রীপিনাকীনাথ ব্যানার্জি (গ্রাহক নং—৮০)

—নির্দেশ ঃ—

নীচের ছকটীতে যে ইংরাজী অক্ষরগুলি দেওয়া হল তাহার দ্বারা অন্ততঃ কুড়িটা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম বাহির করতে হবে।

বিঃ দ্রষ্টব্য ঃ—একই অক্ষর পুনঃ পুনঃ প্রয়োজন মত ব্যবহার করা যেতে পারে।

"ছক"

U	I	H	L	O
K	B	R	N	N
Z	D	I	M	A
E	P	A	A	G

চৈত্র মাসের ধাঁধার উত্তর

১। দরজা ২। আলু ও মটরশুটি = আম

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, চৈত্র মাসে প্রকাশিত ধাঁধার উত্তর কারও ঠিক হয় নি। তাই উত্তর দাতাদের নাম দেওয়া গেল না। আশা করি, আসছে মাস থেকে খুবই চিন্তা করে তোমরা সকলেই জবাব দেবে।

সম্পাদিকার চিঠি

ছোট বন্ধুরা,

শুভ ১লা বৈশাখ নূতন বছরের প্রথম আলোর আশীর্বাদ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। রাত্রির অন্ধকারের পর, নববর্ষের নূতন আলোর ঝরণাধারা, বিগত দিনের যা কিছু মলিন, যা কিছু জীর্ণ, সব ধুয়ে, মুছে, আমাদের সকলকে বলছে—'ওঠো, জাগো। নূতন উৎসাহে জীবনের পথে এগিয়ে চলো।'

বিগত দিনের যত গ্লানি, ক্ষয়ক্ষতি, বিফলতা আর ভুল বোঝাবুঝি আজ স্মৃতিমাত্র। মনকে তার থেকে মুক্ত করে, অনাগত ভবিষ্যতের বিশাল প্রাঙ্গণে আমাদের কর্তব্যকাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। নববর্ষ এই ভাবেই আমাদের গ্লানিমুক্ত ক'রে, নূতন উৎসাহে, নবীন আশায় অভিষিক্ত করে। এই আনন্দের বাণী বহন করে আনে বলেই, নববর্ষের প্রথম দিনটি দিনপঞ্জীর কোন একটি তারিখ মাত্র নয়। তা একক। তা অনন্য।

গত বছর প্রকৃতির নিষ্ঠুর তাণ্ডব বাংলাদেশে ভয়াবহ ধ্বংসের সৃষ্টি করেছে। অভাব, অনটন, অসুবিধা সবই ঘটেছে চূড়ান্ত রকমের! নববর্ষ আজ আহ্বান জানাচ্ছে সব ক্ষয়ক্ষতির উপরে নিজের শক্তির পরিচয় দিতে হবে। জীবন যখন আছে, জীবন-সংগ্রামও থাকবেই। নববর্ষ সেই শক্তি-পরীক্ষায় দৃঢ়তার পরিচয় দিতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করছে। বিগতর জন্য শোক নয়, অনুশোচনা নয়, নববর্ষের লক্ষ্য উজ্জ্বল ভবিষ্যত আর সফলতার স্বপ্ন।

আজ তোমাদের প্রিয় শিশুসাথীর জন্মদিন। শিশুসাথীর ৪৭ বছর পূর্ণ হল। আরো সুদীর্ঘদিন শিশুসাথী বাঙালী শিশু ও কিশোরদের অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে থাক। শিশুসাথীর দীর্ঘ জীবন কামনা করার সঙ্গেই, শুভানুধ্যায়ীদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। এই শুভদিনে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে শিশুসাথীর সম্পর্ক মধুরতর হোক। এই আনন্দমেলায় শিশুসাথী দু'হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানাচ্ছে নূতন বন্ধুদের।

প্রতি বছরে বৈশাখ আর একটি অসাধারণ দিনকে স্মরণ করিয়ে দেয়! সে-দিনটি ২৫শে বৈশাখ। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার পুণ্যস্পর্শে যে নবজাতক একদিন পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়েছিল, সেই বিশেষ জন্মদিনটি ১০৭ বছর আগেকার। আমাদের আকাশে-বাতাসে, আমাদের চিন্তাধারায়, সেই কবির লোকোত্তর মহিমার প্রভাব এতটুকুও ম্লান হয় নি। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়—'তিনি আমাদেরই লোক।' সবদিক দিয়ে এমন একটি পূর্ণ মনুষ্যত্ব সহজে চোখে পড়ে না। শুধু গানে আর কবিতায়ই নয়, সমস্ত দেশের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তা আর কর্মধারায়, ঋষি রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সত্যিকারের আদর্শকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই বিশেষ চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলে, দেশের মঙ্গল হবে।

২৫শে বৈশাখের উৎসব এখন যেন একটা গতানুগতিকতায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র চিন্তাধারার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত না হয়ে, তাঁর আদর্শ সম্বন্ধে কিছুই না জেনে, বছরের একটিমাত্র

[illegible] রবীন্দ্র সঙ্গীত অথবা রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য পরিবেশন করলেই ২৫শে বৈশাখের উৎসবকে সার্থক করা যায় না। উৎসবের দিন হল আত্মাকে বড়ো করার দিন, নিজেকে বড়ো করার দিন। ২৫শে বৈশাখের উৎসব পরিপূর্ণ হবে রবীন্দ্র-চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হলে। নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদিতে তোমরা অংশগ্রহণ করবে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেইসঙ্গে মনে রাখবে, রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করে, কবিগুরুকে জানবার, চিনবার, তাঁর মনের কাছে যাবার মত প্রস্তুতিও দরকার। সেটাই হবে ২৫শে বৈশাখের সত্যিকারের উৎসব।

নববর্ষের আন্তরিক শুভকামনা জানিয়ে আজকের চিঠি এখানেই শেষ করছি।

১লা বৈশাখ,
১৩৭৬

শুভার্থিনী—
তোমাদের সম্পাদিকা

বিজ্ঞপ্তি

শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

এ বছর শিশুসাথীর অন্যতম লেখক শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী ভারত সরকারের কাছ থেকে এক হাজার টাকার "রাষ্ট্রীয় পুরস্কার" পেলেন, তাঁর লেখা "আমাদের প্রতিবেশী কীটপতঙ্গ" নামক বইটির জন্য। এর আগেও তিনি দু'বার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছেন।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী ছোটদের জন্য বাংলায় সর্বপ্রথম নানারকম হাতের কাজের বই লিখে শিশু-সাহিত্যে একটা নূতন পথ দেখিয়েছেন। তাঁর লেখা 'বাংলার কুটিরশিল্প' ও 'আমাদের প্রতিবেশী কীটপতঙ্গ' পড়লে তোমরা নিজেদের দেশ ও পরিবেশ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানতে পারবে।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী তাঁর পাঠ্যাবস্থা থেকেই শিশুসাথীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 'শিশুসাথীর' পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। —সম্পাদিকা

সম্পাদিকা—**শ্রীমতী দাশগুপ্ত**
৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ছোটদের উপযোগী বই

এক যে ছিল শেয়াল—শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রিত ও রচিত অরণ্যের জীবজন্তুর রোমাঞ্চকর জীবনযাত্রার কাহিনী। [১·৫০]

ছবির খেলা ১—শ্রীবাদল সরকার রচিত ও চিত্রিত ছোটদের ধাঁধার বই। বাঙলায় এমন বই এই প্রথম। [২·০০]

খেলার সাথী—স্বপনবুড়োর রচনা ও শ্রীসমর দের বর্ণালী ছবি। ভারত সরকার কর্তৃক প্রসংসিত। [২·৫০]

ছুটির দিনে মেঘের গল্প—[১ ৫০] **শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে**—[২·৫০]
দুটি বইই ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তর হাতের মিষ্টি ছন্দে ও শ্রীসূর্য্য রায়ের ছবিতে অনুপম।

চেষাবেষা ৩ (চালাকবোকা)—মৌমাছি রচিত শ্রীধীরেন বল চিত্রিত সরস গল্পের বই। [১·০০]

যুবকল্যাণ—শ্রীবিনয় ঘোষ রচিত সমাজকল্যাণমূলক বই। [১·০০]

জলের রূপকথা—ডঃ বীরেশ গুহ কর্তৃক জলের বিজ্ঞান কথা। [১·০০]

নবীন রবির আলো—ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য কর্তৃক রবীন্দ্রনাথেব ছেলেবেলার জীবনকথা। অনেক ছবি—শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তীর আঁকা। [১·৭৫]

ছেলেবেলার বিবেকানন্দ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক স্বামীজীর ছেলেবেলার কথা। শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তীর আঁকা অনেক ছবি। [২·২৫]

যুগে যুগে ভারত শিল্প—শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তীর লেখা ও আঁকা ভারতের শিল্প নিদর্শনের ইতিহাস। অদ্বিতীয় বই। [৭·০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ
৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

হাসির ঘণ্ট

যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

যোগীনবাবুর নতুন হাসির বই। পাতায় পাতায় শিল্পী সুবোধ দাস গুপ্তের আঁকা রংবেরং-এর ছবি—ছড়া ও কবিতার সঙ্গে পাল্লা-দেওয়া, আশ্চর্য সব মজাদার রচনা।

★

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪।৩-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

Phone : 67-3329

Good Dog-Chuck means that of :—

NATIONAL
MACHINE TOOLS CO.
(N. M. T. Co.)
Manufacturers, Repairers and Dealers.
Head Office & Factory :—
10/10, Brindaban Mullick Lane, Kadamtala, Howrah.
(W. B.)

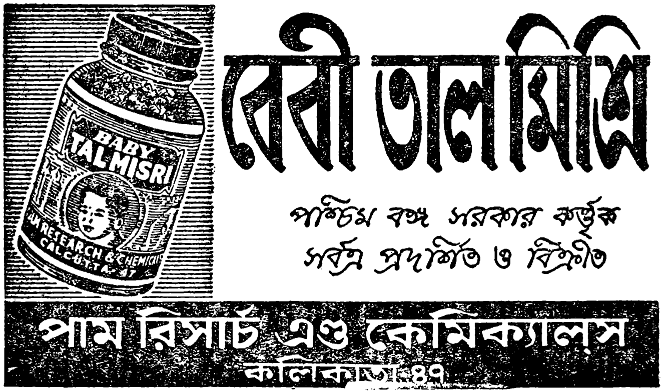
BABY TALMISRI
PALM RESEARCH & CHEMICALS
CALCUTTA-47

বেবী তালমিস্রি

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক
সর্বত্র প্রদর্শিত ও বিক্রীত

পাম রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যালস
কলিকাতা-৪৭